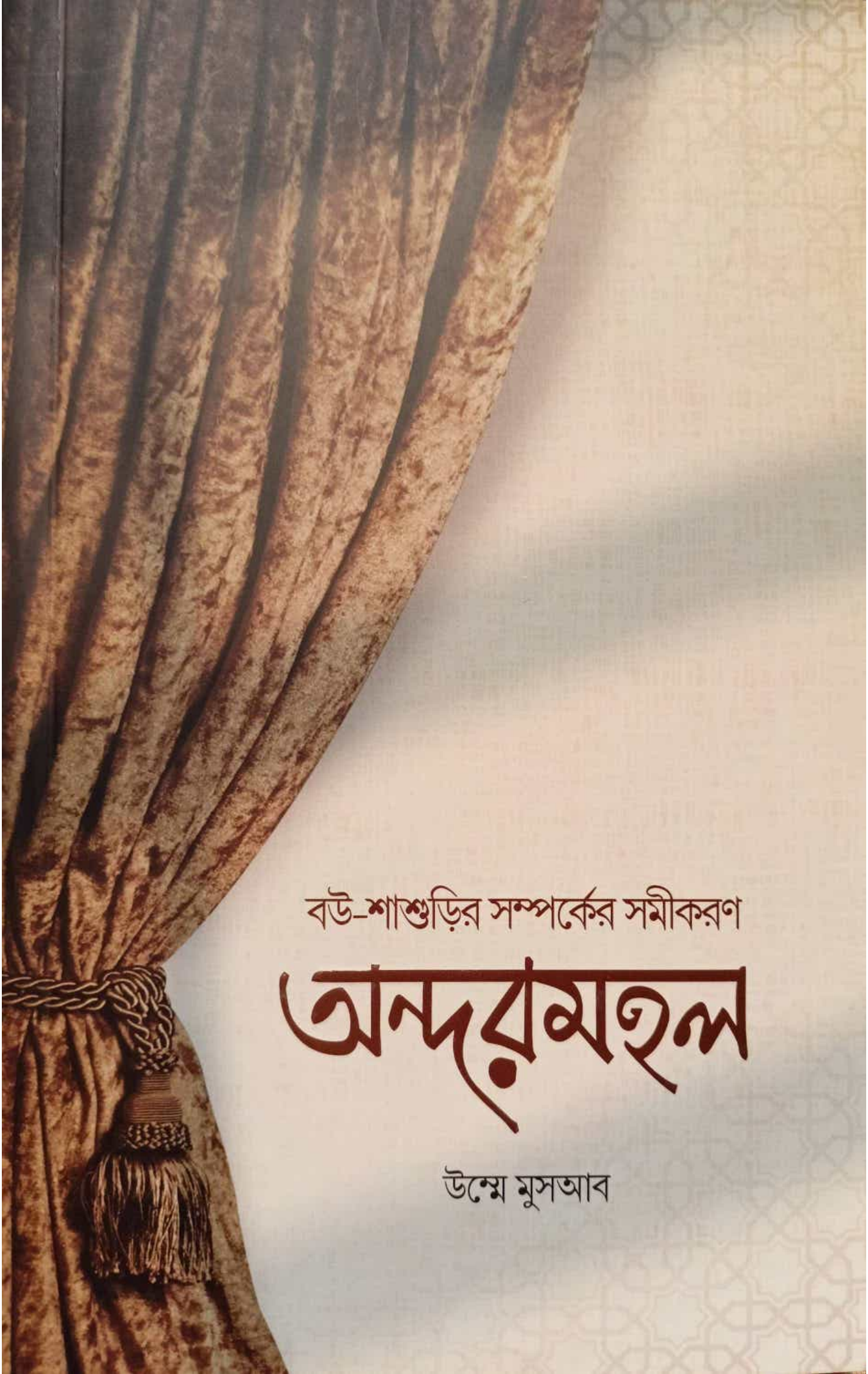

বউ-শাশুড়ির সম্পর্কের সমীকরণ

অন্দরমহল

উম্মে মুসআব

তিনি শুধু আপনার শাশুড়ি-মা নন,
আপনার স্বামীর জান্নাত।

মেয়েটি শুধুই আপনার পুত্রবধূ না,
আপনার ছেলের দুনিয়া-আখিরাতের
চিরস্থায়ী সঙ্গী।

cover মুহারেব মুহাম্মাদ
০১৬০০১৮৭৭৬১

বউ-শাশুড়ির সম্পর্কের সমীকরণ

অন্দরমহল

উম্মে মুসআব

বউ-শাশুড়ির সম্পর্কের সমীকরণ

অন্দরমহল

উম্মে মুসআব

সম্পাদনা
মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ

উমেদ
প্র কা শ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

নাযরানা

এ বই যাদের উৎসর্গ করা হলো :

- শ্রদ্ধেয় খালাম্মাকে, যিনি মেয়েদের আমল-আখলাক ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তরবিয়তখানা। মুহতারাম আদিব হুজুর (হাফি.)-এর বোন, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী (হাফি.) হুজুরের সহধর্মিণী এবং আমাদের আলমডাঙ্গার পুত্রবধূ।
- আমার শ্রদ্ধেয় মা, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া এক সংসারযোদ্ধা। একপ্রকার জোর করেই যিনি যথাসময়ে আমার সংসার জীবন শুরু করিয়ে দিয়েছেন। মানে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।
- আমার সম্মানিত শাশুড়ি-মা, একেবারে আনাড়ি বউ-মাকে যিনি কষ্ট করে সংসারের খুঁটিনাটি শিখিয়েছেন এবং এখনো শেখাচ্ছেন।
- রত্নগর্ভা দুজন নারী—আমার খালা শাশুড়ি ও আমার দাদি শাশুড়ি। যারা আমার জন্য অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত।
- এবং প্রিয় ভাবিকে, এ বই লেখার প্রস্তাবনা প্রথম যিনি দিয়েছেন। বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যে তথ্যভিত্তিক কোনো বই লেখা যায়, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। ইচ্ছা তো দূরের কথা। আবার লেখা শুরুর পর থেকে লাগাতার খোঁজখবর নিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন, নানারকম তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। পর্দা ও সংগত কিছু কারণে উনার পরিচয় দিতে পারছি না, তবে উনার নামের শেষ অক্ষর 'ম'।

কৃতজ্ঞতা

প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের ওপর।

- শুকরিয়া হযরত মুফতী নুরুল আমিন সাহেব হাফিযাহুল্লাহ (খলীফা, আরিফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রতি। যার কাছ থেকে আমরা গুনাহ ছেড়ে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার শক্তি পাই। আল্লাহ তাআলা শায়খকে দীর্ঘ সুস্থ ও নেক হায়াত দান করুন।
- শুকরিয়া শায়খ ইমদাদুল হক সাহেব হাফিযাহুল্লাহর প্রতি, যার দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য পাথেয়।
- উমেদ টিমের প্রতি শুকরিয়া, বিশেষ করে নতুন লেখকদের প্রতি আস্থা রাখার জন্যে। আল্লাহ তাআলা উমেদ প্রকাশকে আরও সমৃদ্ধ করুন।
- কৃতজ্ঞ মুসআবের আব্বুর প্রতি—বইয়ের প্রত্যেকটা টপিকের প্রথম সম্পাদক তিনিই। লেখালেখির সবচেয়ে বড় উৎসাহদাতা ও বকাঝকাদাতা। 'ম্যাচ করছে না, প্রসঙ্গ চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিগন্যালিং ব্রেক, রেফারেন্স কোথায়, লেখা এমন হয়েছে কেন, পড়ার মধ্যে কোনো টান আসছে না, কী লিখেছ এসব' ইত্যাদি আর কত কী যে শুনেছি!

বইটি কীভাবে পড়লে ভালো হয়?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, গল্প-উপন্যাস বা কল্পকাহিনি পড়ার ধরন আর প্রবন্ধ কিসিমের তথ্যভিত্তিক বই (নন-ফিকশন) পড়ার ধরন নিশ্চয়ই এক হবে না। কোন ধরনের বই আপনি পড়ছেন তার ওপর নির্ধারিত হবে 'কীভাবে বইটি পড়তে হবে'।

আগেই বলে রাখি, অন্দরমহল বইটি প্রধানত বউ-মাদের জন্য। ঘর-সংসার ও বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তারা বেশ ব্যস্ত থাকেন। মন স্থির করে বসে বই পড়ার সময়-সুযোগ বা পরিস্থিতি খুব কমই পান। আবার দীর্ঘদিন তথ্যভিত্তিক বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা না থাকার কারণে পাঠাভ্যাসও কিছুটা নাজুক; তারা যদি ছোটখাটো কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাহলে আশা করা যায় কিছু উপকার অবশ্যই বেশি পাবেন।

এখন কথা হলো, আপনি কেন বইটি হাতে নিয়েছেন? কেনই-বা পড়তে চাচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরটা পরিষ্কার হওয়া আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেকজনের একেক রকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কেউ 'বউ-শাশুড়ি' সম্পর্ক বিষয়ক কোনো সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে বইটি পড়তে পারেন। কেউ সম্পর্কটাকে বিস্তারিত জানার জন্য, কেউ-বা এখনো বিয়ে করেননি, কিন্তু প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পড়তে পারেন। উদ্দেশ্য যেটাই হোক সেটাই যেন মনের মধ্যে পরিষ্কার থাকে। কোনো উদ্দেশ্যই যদি না থাকে, তাহলে আর পড়ার দরকার নেই।

উদ্দেশ্য ঠিক করার পর বইটি হাতে নিয়ে ফ্ল্যাপ, পেছনের পৃষ্ঠা এবং লেখক পরিচিতিতে নজর বুলিয়ে এরপর সূচিপত্রে চলে যান।। সূচিপত্র পরিষ্কার বুঝতে পারলে আপনি জানতে পারবেন বইটি কোন ধারাবাহিকতায় লেখা এবং আপনার

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ঠিক কোথায় আছে। যে সমস্ত বিষয় উপকারী মনে হয় সেগুলো হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে রাখতে পারেন। এরপর গোটা বইটা একনজরে দেখে নিলেন। এতে আপনি বইয়ের ভেতরের চিন্তার উপকরণের সাথে পরিচিত হলেন। এটুকু পড়ে ভালো লাগলে আপনি সময় নিয়ে বিস্তারিত পড়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেন।

এই মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তুতিটা যত সুন্দর হয় পড়াটা তত নান্দনিক হয়। পাঠক তার পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের মধ্যে এক্সাইটমেন্ট তৈরি করে নিতে পারেন। যেমন : কেউ ঘরের কোনায় বসে বই পড়তে পছন্দ করেন, কেউ-বা চা-কফি নিয়ে বারান্দায় চলে যান। পড়ায় মনোযোগ বাড়ানোর জন্য পেন্সিল, কলম বা কাঠি ব্যবহার করেও পড়তে পারেন। এতে মনও বসে, সাথে সাথে চোখও দ্রুত সামনের দিকে যায়।

পড়া শুরু করার পরে কিছু বিষয় প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিছু উপকারী আবার কিছু বিষয়ে দ্বিমতও থাকতে পারে। বইয়ের পেছনে দেওয়া পরিশিষ্টে আপনি এ সমস্ত বিষয় নোট করে রাখতে পারেন। এই নোটগুলো পরবর্তী সময়ে খুব কাজে দেয়। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক আহমদ ছফাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি পড়ার সময় নোট রাখছেন কি না। ছফা এতে না-বোধক উত্তর দিলে আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'তাইলে ত কোনো কামে অইব না। ক্ষেত চষবার সময় জমির আইল বাইন্ধ্যা রাখতে অয়।' অনেক লেখকের মতে 'বইয়ে দাগানো হলো লেখকের সাথে একমত বা মতপার্থক্যের প্রতীক।' বইয়ে দাগাদাগি করার সময় কিছু ব্রেনস্টর্মিং হয়, ফলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়।

বইটিতে বড় তিনটি ভাগ আছে। বউ-মা হিসেবে কিছু ভুল, শাশুড়ির চিন্তার কিছু ভুল এবং সবশেষে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয়। এরপর করণীয় বিষয়কে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : বউ-মা ও শাশুড়ি-মায়ের উভয়ের যৌথ পদক্ষেপ, শাশুড়ি-মায়ের প্রতি নিবেদন এবং বউ-মার স্বতন্ত্র কিছু পদক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে যে সমাধান বা সমস্যাগুলো আপনার কাছে বেশি উল্লেখযোগ্য মনে হয় বা মতের সাথে মেলে, সে বিষয়গুলো আগে পড়ে নিতে পারেন।

একরাতের মধ্যে তাড়াহুড়া করে একটি নন-ফিকশন বই পড়ে ফেলা কোনো কাজের কথা না; বরং বই থেকে নিজের জন্য উপকারী ও মানানসই বিষয়গুলো আমলে আনা এবং বাড়তি সংযোজন-বিয়োজন করে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ তৈরি করা। গল্পগুজবের সময় উঠানো বিষয়গুলো সবার জন্যই বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখকের কথা

রাতে চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠে দরজায় টোকা না দিয়েই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার সাহেব। উনার মা ও স্ত্রী ভেতরে গল্প করছেন আর খিলখিল করে হাসছেন। দরজার বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে সেই হাসির শব্দ। চার বছরের বিবাহিত জীবনে ডাক্তার সাহেব কোনোদিন এ রকম হাসি শোনেননি; বরং এর বিপরীতটাই শুনেছেন দিনের পর দিন। ডাক্তার দাঁড়িয়ে রইলেন, আনন্দে তার গলা ভারী হয়ে এল।

ওই ডাক্তারের মতো সব ছেলেরাই চায় তার মা ও স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকুক। কেননা পুরুষের জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই দুজন নারী। সংসারে এই দুই নারীর আন্তরিক মেলবন্ধন সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় পুরুষকে। সারা দিন কাজকর্ম-ব্যস্ততা সেরে বাসায় ফিরে একবার মায়ের কাছ থেকে কমপ্লেইন, আরেকবার বউয়ের কাছ থেকে কমপ্লেইন কার ভালো লাগে? গেলাও যায় না, উগলানোও যায় না। মন করে না আর ঘরে ফিরি! দিনে দিনে এসব ছোটখাটো অভিযোগগুলো এদিক-সেদিকের এলোপাতাড়ি বাতাসে ফুলে-ফেঁপে একসময় এতই মারাত্মক হয় যে, অনেকের সংসার টেকানো দায় হয়ে যায়।

শুধু কি তা-ই? সমাজের মধ্যেও সম্পর্কের এহেন মারপ্যাঁচ নিয়ে একধরনের ম্যারেজ ট্রমা কাজ করে। বিয়ে কঠিন হয়ে যায়। ছেলে পর হয়ে যাবে সেই ভয়ে বা বউমা-আতঙ্কে অনেকেই ছেলেকে বিয়ে দিতে গড়িমসি করেন। আবার অনেক মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, কারণ তাকে এক Mother in Law না, বরং Monster in Law এর মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি কি এমন ছিল?

যাই হোক, সমূহ ধোঁয়াশাকে পাশ কাটিয়ে এই স্বতন্ত্র সম্পর্কটির যত্নের তাগিদে

লেখা হয় 'অন্দরমহল'। এ বইটি লিখতে প্রায় শতাধিক পুত্রবধূ, শাশুড়ির ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে। জরিপে উনাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল উনাদের শাশুড়ি-মার, বউ-মার (তিনটি করে) ভালো দিক ও খারাপ দিক এবং মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল তাদের 'সম্পর্ক' নিয়ে। দেখা গেছে, অধিকাংশ শাশুড়ি বা বউ-মার অভিযোগ বা অনুরাগের ধরন প্রায় একই রকম। সেই মন্তব্যগুলোর সারমর্ম ও দেশি-বিদেশি কিছু বইয়ের সাহায্য নিয়ে সাজানো হয়েছে বউ-মা হিসেবে আমাদের কিছু ভুল ও শাশুড়ি হিসেবে কিছু ভুল অধ্যায় দুটি। আর বিবাহিত বোনদের মেন্টরিং-এর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং বেশ কয়েকটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লেখা হয়েছে সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় অধ্যায়টি।

এ বইয়ে কোনো টনিকের কথা বলা হয়নি, যা আজ রাতে খেয়ে আপনি ঘুমালেন আর সকালে উঠে দেখলেন আপনার সম্পর্কের সব সমস্যা ভালো হয়ে গেছে! এমনটি হবে না। সাত দিনে ২০ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলতে চাই, মাত্র তিন দিনে অ্যান্টি-এইজিং ক্রিম মেখে বয়সের ছাপ তুলে ফেলতে চাই! চাই রাতারাতি মনমতো কিছু একটা ঘটে যাক! কিন্তু এসব ঘটে না। মনে হয়, 'ভাগ্যটাই খারাপ'!

সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের মতো সুসম্পর্কের জন্যও প্রয়োজন লাগাতার যত্ন ও পরিশ্রম। ভোগবাদী সমাজ ও কমার্শিয়াল মার্কেটিংয়ে হিপনোটাইজড হয়ে পরিশ্রমের পুরোনো রীতির মূল্যবোধ যদিও আজ আমরা হারাতে বসেছি, তবুও সবকিছুই নির্ভর করে আপনি-আপনার সম্পর্কগুলো কীভাবে দেখতে চান তার ওপর। দৃঢ় ইচ্ছা অবশ্যই একটি উপায় বের করবে।

আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার কোন কোন দিক 'বউ-শাশুড়ি' সম্পর্কটির সৌন্দর্য অনুধাবন করতে বাধা দেয়, আর কোন কোন বিষয় এই সৌন্দর্য উপভোগে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে—তা নিয়ে মোটামুটি তথ্যভিত্তিক আলোচনা রয়েছে 'অন্দরমহল' বইটিতে। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো দেখতে খুবই সামান্য, কিন্তু আয়ত্ত করে নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ফলাফলটা নিঃসন্দেহে হবে দেখার মতো। অনুল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোই এনে দেবে আমূল পরিবর্তন।

সূচিপত্র

শুরুর কথা ১৫

বউ-মা হিসেবে কিছু ভুল ১৭

১.দায়িত্বশীল না হয়ে অধিকার আদায়ের পেছনে ছোটা ১৭

২. আগে জানলে কখনো বিয়েই করতাম না ১৮

৩. দোষ ধরাধরি খেলা ২১

৪. চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়েছেন? ২৪

৫. অলসতা ২৬

৬. রাগ হচ্ছে কেন? আর রাগ দেখাচ্ছি কোথায়? ২৯

৭. অমুক ভাবির এটা আছে, অমুক ভাবির এটা নেই ৩০

৮. বাচ্চার দেখাশোনার জন্য শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা ৩১

৯. বাবার বাড়ির গল্পে মুখরিত থাকা ৩১

১০. সংসার ও ব্যক্তিগত কাজের মাঝে গুরুত্ব নির্ণয় করতে না পারা ৩২

১১. শাশুড়ির স্নেহের অংশীদার হতে নিজেকে মেয়ের মতো মনে করা ৩৪

১২. পারিবারিক নিয়ম মানাকে পরাধীনতা মনে করা ৩৫

শাশুড়ি হিসেবে আমাদের কিছু ভুল ৩৮

১. বউকে কড়া শাসনে না রাখলে মাথায় চড়ে বসবে ৩৮

২. মা-ছেলের ভালোবাসায় ভাগ বসাতে এসেছে বউ ৪১

৩. ছেলে-বউমার সব সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা ৪৪

৪. ভুল সংশোধনের নিমিত্তে ভুল পদ্ধতি ৪৬

৫. বউ-মাকে মেয়ের মতো মনে করা ৪৭

৬. তুলনা ৪৮

৭. বউ-মাকে দায়িত্ব শেখাতে অতি ব্যস্ততা ৫০

৮. মুখের ওপর সত্যি কথা বলি তো, তাই আমি খারাপ ৫২

৯. একাধিক পুত্রবধূকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা ৫৩

সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় ৫৫

বউ-মা ও শাশুড়ি-মায়ের উভয়ের প্রতি নিবেদন ৫৬

১. নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ৫৭

(ক) নিজের প্রতি ভালোবাসা বা আত্মানুরাগ (Self-Love) ৬১

(খ) নিজস্ব দায়িত্ববোধ (Self-Responsibiity) ৬৬

(গ) দায়বদ্ধতা (Self-Accountibility) ৭৩

(ঘ) সংশ্লিষ্টতা (Self-Attachment) ৭৫

(ঙ) আত্মনিয়ন্ত্রণ (Seft-Control) ৮০

২. সমালোচনা বা পারস্পরিক মন্তব্য ৮৩

৩. সম্পর্কের আশা-প্রত্যাশা ১০৫

৪. রাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ১১৬

৫. কিছু কিছু অপছন্দনীয় বিষয় মেনে নেয়া ১২৮

৬. আত্মমুগ্ধতা বা উজব সম্পর্কিত সচেতনতা ১৩০

৭. মনঃকষ্ট বা যেকোনো সমস্যা শেয়ারের জন্য সঠিক মানুষ নির্বাচন ১৩৪

৮. কৃতজ্ঞতা ১৩৮

শাশুড়ি-মায়ের প্রতি নিবেদন ১৪৫
১. ছেলে কিন্তু আগের মতো থাকবে না! ১৪৫
২. জড়িয়ে ধরার সময় এত চাপ দেবেন না, যে বউ-মার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় ১৪৭
৩. উপদেশের ঝরনাধারা থেকে বিরত থাকা ১৪৮
৪. তাড়াহুড়া করা ১৪৯
বউ-মার করণীয় ১৫১
১. কাকে গুরুত্ব দেব? কখন গুরুত্ব দেব? ১৫৩
২. স্বামীর আনুগত্য ১৫৮
৩. নিজের কাজটুকুতে দক্ষ হওয়া ১৬৪
৪. আকর্ষণীয় নারী হতে কোন ব্র্যান্ডের মেকআপ প্রয়োজন? ১৭০

শুরুর কথা

বিয়েতে কবুল বলার সাথে সাথে একদম নতুন ধরনের অনেকগুলো সম্পর্ক তৈরি হয়। নতুন সম্পর্কের রেশ ধরে মায়েরা শাশুড়ি হয়ে যায়, মেয়েরা বউ-মা হয়ে শ্বশুরবাড়িতে যায়।

সেখানে সম্পর্কগুলোই শুধু নতুন না। সেখানকার পরিবেশ, মানুষজনের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, মতামত ও মতামত দেয়ার পদ্ধতি, রান্নার স্বাদ, ঘ্রাণ, পারিবারিক গল্প, গল্পের বিষয়বস্তু সবকিছু নতুন। ভিন্নধারার এসব পরিস্থিতির সাথে বউ-মাকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। শুধু বউ-মারই নতুন অভিজ্ঞতা হয় তা নয়, শাশুড়ি-মাকেও অনেক নতুনত্বের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

এসব নতুন সম্পর্ক ও পরিস্থিতিগুলোকে যথাযথভাবে সামলে নিতে বউ-শাশুড়ির একমাত্র পুঁজি—মা-খালা-ফুপু-দাদি-নানির উপদেশ, অভিজ্ঞতা। মা-খালাদের অভিজ্ঞতাগুলো স্বাভাবিকভাবেই পনেরো-বিশ বছরের পুরোনো, আর দাদি-নানিদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। অভিজ্ঞতাগুলো নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ এর কারণে সব অভিজ্ঞতা বা উপদেশ মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ময়দানের সবকিছু কাভার করে না, আবার সব পরিস্থিতিতে খাপও খায় না।

আবার উনারা হয়তো উনাদের সমস্যাগুলো যেকোনো উপায়ে সমাধা করে ফেলেছেন, কিন্তু আরেকজনকে শেখানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় সমাধানটা ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারেন না।

আরেকটা বিষয়, বউ-মা অথবা শাশুড়ি-মা যখন তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আপনজনদের সাথে শেয়ার করেন, তখন কেউ হেসে উড়িয়ে দেয়, কেউ খুবই হালকাভাবে নেয়, কেউ কেউ মজা হিসেবে নেয়। আবার কেউ কেউ এত

আবেগি হয়ে যান যে আপনজনের সমস্যার কথা শুনে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। আবার অনেক সময় এসব সমস্যা এতটা ইউনিক হয় যে মা, খালা বা বড় আপাদের বলে বোঝানো সম্ভব হয় না। তখন মোটাদাগে বাস্তবসম্মত কিছু নির্দেশনার দরকার হয়।

এই বইতে বউ-শাশুড়ি সম্পর্কের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে, কিছু সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নির্দেশনা যে আপনার সব সমস্যার সমাধা করে ফেলবে এমন না, তবে আগে কোনো সমস্যায় পড়লে হয়তো 'ক' 'খ' দুইটি সমাধান নিয়ে ভাবতেন, এখন হয়তো আরও অতিরিক্ত 'গ' 'ঘ' দুইটি সমাধান নিয়ে ভাবতে পারবেন।

এই বইটিকে মূলত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে।

১. বিবাহিতার কিছু ভুল ধারণা

২. শাশুড়ি-মায়ের কিছু ভুল ধারণা

৩. সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় (তিনটি ভাগে এ অংশটি বিভক্ত)

   ক. বউ-মা ও শাশুড়ি-মায়ের উভয়ের কিছু কাজ

   খ. শাশুড়ি-মায়ের করণীয় কিছু দিক

   গ. বউ-মার করণীয় কিছু দিক

দেখুন, আমরা যখন ঘরবাড়ি গোছগাছ করি তখন সবার আগে ময়লা-আবর্জনাগুলো সরাই। এখন আপনি যদি না চেনেন কোনটা আবর্জনা আর কোনটা প্রয়োজনীয় জিনিস, তাহলে আপনি চাইলেও ঘরটা সুন্দরভাবে সাজাতে পারবেন না। তেমনি আপনি যদি না জানেন আপনার কী কী ভুল হচ্ছে, তাহলে ভুল দূর করবেন কীভাবে? এই বইয়ের প্রথম দুই ভাগে ভুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবর্জনা চিনে সরিয়ে ফেললেন, ঘর পরিষ্কার হলো। এখন ঘরটাকে যদি আরেকটু সুন্দর করে সাজাতে চাই তাহলে আমাদের আরও কিছু জিনিসপত্র প্রয়োজন হবে। এই বইয়ের শেষাংশে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (অর্থাৎ, পদক্ষেপ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বউ-মা হিসেবে কিছু ভুল

১.দায়িত্বশীল না হয়ে অধিকার আদায়ের পেছনে ছোটা

- আমি এই বাড়ির ছেলের বউ, ভবিষ্যতের কর্ত্রী। এটা আমার প্রাপ্য আমার অধিকার। প্রথম দিন থেকেই এই অধিকার আমাকে আদায় করে নিতে হবে! যা করার প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে।

- আমার বাবা অমুক, আমার ভাই অমুক আর আমি শ্বশুরবাড়িতে এসে কাজ করব!

- আমি এই বাড়ির একজন সদস্য, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার একটা জায়গা অবশ্যই থাকতে হবে।

- আমার মর্যাদা আমাকেই আদায় করে নিতে হবে। যত ছাড় দেব ততই সবাই পেয়ে বসবে! এ বাড়িতে পা দিয়েই আমার বোঝা হয়ে গেছে, কীভাবে কাকে বাগে আনতে হয়!

শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে না-দিতেই কিছু কিছু বিবাহিতার মনের মধ্যে এসব ভুলভাল চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ চাহিদাগুলোর উৎপত্তি যে শুধু বিবাহিতার চিন্তার মাধ্যমেই ঘটে তা না; বরং তৃতীয় পক্ষও বড় একটি ইন্ধন জোগায়।

নিঃসন্দেহে এটা বিবাহিতার চিন্তার একটি ভুল ধারা। শ্বশুরবাড়ি এসে অধিকার আদায়ে খুব বেশি তাড়াহুড়া করলেই কি তাড়াতাড়ি এই অধিকার পাওয়া যায়? অধিকার তো এভাবে আসে না।

আপনার শ্বশুরবাড়ির সমস্ত জিনিসপত্রের ওপর সে বাড়ির সদস্যদের একটা

অধিকার আছে। এ অধিকার তারাও দুয়েকদিনে পায়নি। আপনি এ বাড়িতে যেখানে যা কিছু দেখছেন কোনো কিছু কিন্তু দুয়েকদিনে হয়ে যায়নি। এ-বাড়ির মানুষগুলোর অনেক চেষ্টা-মেহনত এসবের সাথে জড়িয়ে আছে। এই চেষ্টা-মেহনতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই বাড়ির সদস্যদের অধিকার। যে বেশি দায়িত্ব নিয়েছে, সে বেশি অধিকার পেয়েছে। দায়িত্বশীল না হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা বিবাহিতার বড় একটি ভুল।

দেখুন, আপনার আশেপাশে এমন অনেকেই আছে, সংসারে তার কী কী প্রাপ্য, কোন কোন জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে শতভাগ তার জানা; কিন্তু কী কী দায়িত্ব তার আছে সে সম্পর্কে জ্ঞান খুব ভাসাভাসা। এমনকি সংসার ভাঙার ঘটনাগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়ের অভিযোগ 'তার অধিকার আদায় করা হচ্ছে না!' ওদিকে আমাদের দেশের নারীবাদী সংগঠনগুলোও নারী-অধিকার নিয়ে যতটা সোচ্চার, দায়িত্ব নিয়ে ততটা নয়।

ধরুন, আপনার ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য আপনি একজন মানুষ রাখলেন। সেই কাজের মেয়েটা এসে কথায় কথায় বলে, অমুক ফ্ল্যাটের বুয়া এই এই সুবিধা পায়, ওই এলাকার কাজের বুয়াদের সবাই খুব সমীহ করে, অমুক আপা বেশি বেতন দেয়, অমুক বাড়িতে ঈদে অনেক বকশিশ পাওয়া যায়। তাহলে আপনার কেমন লাগবে? হয়তো তাকে সতর্ক করে বলবেন কথা কম বলে তোমার যা কাজ আছে সেটা ভালো করে করো। অনেকে বিরক্ত হয়ে এমন কাজের মানুষ বাদ দিয়ে দেবেন। ঠিক কি না? অতিরিক্ত অধিকার সচেতনতা আমাদের কারোরই ভালো লাগে না।

আর আসলে আপনার অধিকার নিয়ে কে ভাবে? আপনি যত দায়িত্ব পালন করবেন, তত বেশি অধিকার আদায়ের জগতে প্রবেশ করবেন—এটা সত্যি।

২. আগে জানলে কখনো বিয়েই করতাম না

বউ নতুন হোক বা পুরোনো হোক, অনেক বউ-মার মুখেই শোনা যায়—'বিয়ে-শাদিতে এত সমস্যা! আমি বলে এই সংসার করে গেলাম, অন্য কেউ হলে কবে ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেত!'

বড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনেকে এভাবেও বলেন, 'আগে জানলে সংসারই করতাম

না! আমি আর এদের থেকে কোনো কিছু আশা করি না! এদের কোনো পরিবর্তন হবে না! বিয়ে যখন হয়ে গেছে কিছু তো আর করার নেই, থাক, যেমন চলছে চলুক!'

এই আপনাকেই যদি বলা হয়—এভাবে থাকার দরকার কী? চলে যান। তখন অনেকেই আবার বলেন, চলে যাওয়া কি মুখের কথা? সংসার ভাঙা কি এতই সহজ?

ধরুন, আপনি সব ছেড়ে-ছুড়ে স্বাধীন হয়ে গেলেন। এখন কি আপনার কোনো সমস্যা থাকবে না? আপনাকে যদি হিসাব করতে বলা হয়, বিয়েটা হয়ে ভালো হয়েছে, নাকি না হলে ভালো হতো? তাহলে আপনি হিসাব করে কী পান?

যদি আপনার হিসাব বলে, বিয়ে করে কিছুটা হলেও ভালো হয়েছে, তবে কেন বারবার মুখে বলেন—আগে জানলে বিয়েই করতাম না?

আর যদি আপনার হিসাব বলে, বিয়ে করে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে, তবে ভিন্ন পদক্ষেপ না নিয়ে কেন নিজেকে ক্ষতির সম্মুখীন করছেন?

অনেকে এমন আছেন, যারা জানেন-বোঝেন, বিয়ের পরে তারা তুলনামূলক ভালো আছেন; তারপরও তাদের মুখ বিয়ে সম্পর্কিত হতাশা, নেতিবাচক কথাবার্তা আর অভিযোগে সিক্ত থাকে। এসবে লাভ কী, পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়া ছাড়া? আপনার এ ধরনের কথাবার্তা যদি আপনার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন শোনে, তখন তাদের কতটুকু ভালো লাগবে? এতে আপনার প্রতি তাদের মহব্বত বাড়বে না কমবে?

তবে হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে নিত্য-নতুন হরেক রকমের সমস্যা একেকজনের জীবনে আসে। আজ এক সমস্যার সমাধান হয়, কাল আরেক সমস্যার সূত্রপাত হয়। এটাই কি স্বাভাবিক না? সমস্যা আসলে সমাধান করতে হবে, এক পথে সমাধান না হলে আরেক পথ খুঁজতে হবে। সমাধান আসবে না মনে করা বা সমাধান আসবে না ভেবে সমাধানের সমস্ত পথকে সিসা ঢেলে বন্ধ করে দেয়া কতটুকু উপকারী? সমস্যা দেখলে হতাশার কথাবার্তা যারা বেশি বলে, তাদের জন্য সমাধান টেনে বের করা কঠিন হয়ে যায়।

বিবাহিত নারীদের সংসারে এ ধরনের হাল ছাড়া কিসিমের কথাবার্তা খুব একটা

উপকার বয়ে আনে না। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন না?

কুরআনের একটি সূরার নাম সূরা লাইল। লাইল মানে রাত। এটি কুরআনের ৯২ নম্বর সূরা। এর পরের সূরার নাম সূরা দুহা। দুহা মানে পূর্বাহ্ন—দিন। এটি কুরআনের ৯৩ নম্বর সূরা। এর সহজ অর্থ হলো রাতের পরই দিন। হ্যাঁ, রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত কাছে। যার পেছনে যত অন্ধকার, তার সামনে তত আলো। এ তো গেল তাত্ত্বিক কথাবার্তা। কুরআনে দুঃখের পরই সুখের উল্লেখ রয়েছে। রয়েছে কঠিন পথের শেষে সহজ-সুন্দরের বার্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

'নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।'[১]

রাতের অন্ধকার পেরিয়ে প্রভাতেই রক্তিম সূর্যোদয় হয়।
এমন কোন রাত আছে, যে রাতের পর সুপ্রভাত হয়নি?

মহান মালিকের সতর্কবাণী :

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝٥٣ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۝٥٤ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۝٥٥ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝٥٦

'তারা (ফেরেশতারা ইবরাহীম আ.-কে) বলল, ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি? তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?'[২]

হযরত ইয়াকুব আ. দীর্ঘ অপেক্ষার পরও আশাবাদী ছিলেন। সে আশার বাণী কুরআনে বিবৃত হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানদের বলেছেন,

---

১. সূরা ইনশিরাহ, (৯৪) : ৫-৬
২. সূরা হিজর, (১৫) : ৫৩-৫৬

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

'হে আমার সন্তানেরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান করো। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর রহমত থেকে তো অবিশ্বাসী কাফের ছাড়া অন্য কেউ নিরাশ হতে পারে না।'[৩]

৩. দোষ ধরাধরি খেলা

ও খারাপ, অমুক খারাপ, তমুক খারাপ!

চারিদিকে সবাই যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলেই তো আমি সেরা হয়ে গেলাম! সেরা হবার জন্য যা যা লাগে তা আমার মাঝে থাকুক বা না থাকুক, তাতে কী আসে যায়!

সংসারে নিজেকে ভালো প্রমাণ করার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোকে সহজ উপায় মনে করাও অন্যতম একটা ভুল।

সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া শুধু শুধু ধারণার বশে কাউকে খারাপ মনে করা, খারাপ বলে দেয়া বা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা অতিরিক্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু ধারণা গোনাহ। এবং (অন্যের) গোপনীয় বিষয় সন্ধান কোরো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ

৩. সূরা ইউসুফ, (১২) : ৮৭

করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[৪]

ইমাম কুরতুবী রহ. উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বেশকিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরূপ :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

'হে লোকসকল, যারা (অন্তত) মুখে হলেও ঈমান কবুল করেছ, অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমাদের বলছি শোনো, তোমরা মুসলমানদের গীবত কোরো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান কোরো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে চান, তাকে নিজ গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।'[৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

'তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারও দোষ অনুসন্ধান কোরো না, গোয়েন্দাগিরি কোরো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিয়ো না, পরস্পর হিংসা কোরো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কোরো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ কোরো না; বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে থেকো।'[৬]

---

৪. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ১২

৫. তাফসীরু কুরতুবী, ১৬/৩৩৩; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৮৮০। সহীহ লিগায়রিহি।

৬. তাফসীরু কুরতুবী, ১৬/৩৩১; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৬৬

ওপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

'বাদশাহ যদি প্রজাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়, তবে তো সে তাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।'[৭]

একবার রাতে হযরত উমর রাযি. ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. বের হলেন। তারা দেখতে পান, একটি গৃহে আলো দেখা যায়। তারা প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর তারা দেখতে পান, একজন পুরুষ ও একজন নারী গান গাচ্ছে। পুরুষের হাতে একটি পেয়ালা। হযরত উমর রাযি. বলেন, 'তুমি এরূপ করছ? লোকটি বলল, আপনি এরূপ করছেন, হে আমিরুল মুমিনিন! উমর রাযি. আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মহিলাটি কে?' লোকটি বলল, আমার স্ত্রী। তারপর উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের পেয়ালা?' লোকটি বলল, পানির। হযরত উমর রাযি. মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী গান গাইছিলে?' মহিলাটি তিনটি কবিতা আবৃত্তি করল।

তারপর লোকটি বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'দোষ খোঁজ কোরো না।' হযরত উমর রাযি. বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' হযরত উমর রাযি. নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যান।[৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, হযরত উমর রাযি.-এর মতো একজন খলীফার জন্যও দোষত্রুটি খোঁজা শোভনীয় নয়।

অন্যের দোষ ধরতে থাকলে সমস্যা যেটা বেশি হয় তা হলো—নিজেকে সুন্দর করার মানসিকতাটা নষ্ট হয়ে যায়। সাথে সাথে নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধির চিন্তা করার শক্তিটাও চলে যায়। অন্যকে ছোট করা 'বড়' হওয়ার কোনো উপায় না।

মনে করি, একই সমান তিনটি গাছ আছে।

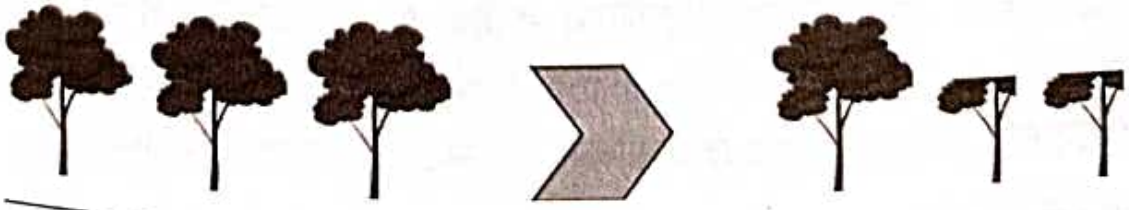

৭. তাফসীরু কুরতুবী, ১৬/৩৩৩; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৮৮৯। হাসান।

৮. তাফসীরু কুরতুবী, ১৬/৩৩৪; মুসতাদরাকু হাকিম, হাদীস নং ৮১৩৬। ইমাম হাকিমের সনদ সহীহ।

দুইটি গাছের অর্ধেক কেটে ফেললে একটি গাছকে উঁচু দেখাবে। অনুরূপভাবে, অনেকে মনে করে, আশেপাশের মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বের করে তাদের ছোট করতে পারলেই আমি বড় হয়ে যাব।

নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য যোগ্যতা, অবদান, কথা ও কাজকে সুন্দর করার পরিবর্তে অন্যকে ছোট করা, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো সত্যিই বিবাহিতার বড় একটি ভুল।

৪. চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়েছেন?

এক গৃহস্থের সমস্ত বাসনপত্র চোর চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। চোরের ওপর রাগ করে সেই গৃহস্থ সিদ্ধান্ত নিল যে, আর কোনোদিন বাসনপত্রই কিনবে না, বাকি জীবন মাটিতেই ভাত খাবে। গৃহস্থের এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা কেমন হলো? ওই গৃহস্থের মতো আমরাও অনেকেই এভাবে মাটিতে ভাত খাই।

আমার এক আত্মীয়ের ছোট্ট একটি ঘটনা শেয়ার করতে চাই। এটা অনেক আগের কথা। ওই আত্মীয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত চমৎকার একটা রীতি আছে—নতুন বিয়ের পর পরিচিত কাছের মানুষেরা দাওয়াত করে নবদম্পতিকে খাওয়ায়, অভ্যর্থনা জানায়।

তেমনি কোনো এক দাওয়াতে যাওয়ার জন্য সেই আত্মীয় বা নতুন বউ নিজেকে তৈরি করছিলেন, চুল বাঁধছিলেন। এমন সময় শাশুড়ি মুখ বাঁকিয়ে নতুন বউকে বলেছিলেন, 'যে না চুলের শ্রী তার ওপর আবার বেণি করা!' এ কথা শোনার পর থেকে ওই বউ-মা পণ করেছিলেন—'জীবনে কোনো দিন আর পরিপাটি হবেন না, এলোমেলো অগোছালো হয়ে থাকবেন!'

সেই শাশুড়ি-মা হয়তো বছর পরে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু বউ-মা সারাজীবন কষ্টের এই অনুভূতিটুকু লালন করে গিয়েছেন সযত্নে। নতুন বউ-মাও বার্ধক্যে উপনীত হয়ে অনেকদিন হলো দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কোনোদিন আর নিজেকে পরিপাটি করেননি।

আপনি আপনার আশেপাশে এমন অনেককে হয়তো দেখতে পাবেন, যারা একজনের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে সেটাকে ভেতরে পেলে-পুষে বড় করছেন,

রাতের ঘুম নষ্ট করছেন। ওদিকে কষ্টদাতা দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনাকে জাগিয়ে রেখে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

আবার অনেকে তো এমন আছে, আরেকজনের কথায় কষ্ট পেয়ে দীর্ঘদিনের ভালো অভ্যাস ছেড়ে দেয়; এমনকি নেক আমলও ছেড়ে দেয়, যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অপরাধ।

মনে করুন, বউ-মার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখল, সেখানে কেউ বারোটা-একটার আগে ঘুমায় না। সে আস্তে আস্তে সুযোগমতো তার ভালো অভ্যাসটাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে, সারাজীবনের জন্য ভালো অভ্যাসটাকে কবর দিয়ে দিল। এটা আসলে তার জন্য কতটুকু উপকারী হলো? হয়তো কিছু ডানে-বামে করা লাগতে পারে। আজ না হয় কাল, এদিক-সেদিক করে হলেও ভালো অভ্যাসটাকে তো জিইয়ে রাখতে হবে। নয়তো আপনার মনের এই ক্ষোভ তো আপনাকেই জ্বালিয়ে মারবে। বারবার আফসোস হবে, ইস! আগে আমি এমন করতাম, ওই আমল করতাম, কিন্তু এখন আর কিছুই করি না।

আবার ধরুন, নতুন বউ-মার ইশরাকের নামাজ পড়ার অভ্যাস আছে। এ কারণে তাকে কেউ একজন খোঁটা দিয়ে বলল, নামাজ-কালাম বোধ হয় আমরা কিছুই করি না, সংসার আগে না ধর্ম আগে! এসব শুনে বউ-মা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল—আর কোনোদিন এখানে নফল নামাজই পড়ব না!

হযরত থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'অহংকার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তার শিকড় মজবুত হয়ে যায়, তখন মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে অহংকার করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হয়তো সে অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআ করছিল, কান্নার ভান করে কাঁদছিল, হঠাৎ সামনে কোনো ব্যক্তি এসে গেল; ফলে সে কান্নাকাটি ছেড়ে দিল। যাতে ওই ব্যক্তির সামনে অসম্মান না হয়। এটা আল্লাহর সাথে অহংকার। কেননা সে অন্য মানুষের সামনে আল্লাহর জন্য অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করতে অসম্মান বোধ করে। অতএব, মাখলুকের জন্য কোনো আমল বা ইবাদত ছেড়ে দেয়াটাও এক প্রকার অহংকার।'[৯]

একটু নিরপেক্ষভাবে ভাবুন তো, আপনার সব আবেগ-অনুভূতির তালা-চাবি

৯. ইসলাহী মাজালিস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭১

আপনার কাছেই থাকা উচিত না? নাকি বাইরের লোকজন আপনার আবেগ-অনুভূতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে আপনি সেভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবেন? আপনি কি পুতুল-নাচের পুতুল? অপরের আজেবাজে কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের সর্বনাশ করা কি বড় একটি অপরাধ না?

আমরা ছোট্ট একটি জীবনীশক্তি নিয়ে দুনিয়াতে আসি। প্রতিশোধের ভুলভাল সংজ্ঞা বুঝে জীবনের অসীম শক্তিকে নিঃশেষ করলে কার ক্ষতি? এতে কার সম্ভাবনা নষ্ট হয়?

দয়া করে চোরের ওপর রাগ করে চোর ধরার চেষ্টা করুন। চোর যাতে কখনো আপনার কিছু না নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

৫. অলসতা

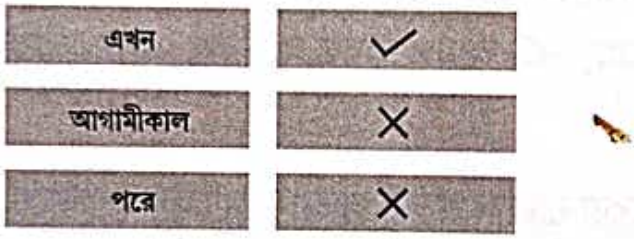

থাক! মশারি খুলে আর কী হবে, রাতে তো আবার টাঙাতেই হবে; আপাতত এমনই থাকুক!

গোসল করে তো আবার এসব কাপড়চোপড়ই পরব, এখন আর কাপড় ভাঁজ করে কী হবে! থাক...।

অমুক ভাবি অসুস্থ, একটু খাবার পাঠানো দরকার। থাকগে আজ ভাল্লাগছে না, পরেরবার অসুস্থ হলে পাঠাব।

বাচ্চাদের পড়তে বসাতে হবে, আজ ইচ্ছা করছে না, থাক! কাল বেশি করে পড়াব।

এখন আর রান্নাঘর গুছিয়ে কী হবে? কাল রান্নার সময় তো আবার সবই এলোমেলো হবে! তারচেয়ে বরং সব হাতের কাছেই থাকুক!

নিশ্চিত না—এসব অলসতা, নাকি দীর্ঘসূত্রতা, নাকি অজুহাত, নাকি বিরক্তি।

তবে এ ধরনের কথাবার্তা যখন আমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় তখন কেমন যেন অলস অলস লাগে। কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হলো, ঘরের ভেতরের পরিবেশ এসব ছোট ইস্যুগুলো নিয়েই বেশি গরম হয়। শাশুড়ি হয়তো চান বউ ঘরটা গুছিয়ে রাখুক! বউ-মা হয়তো ভাবছেন, এ আর এমন জরুরি কী কাজ যে প্রতিদিন করতে হবে! আর শাশুড়ি এতে বকা দিক বা না দিক, এটা আপনার জন্য কতটুকু ভালো যে, আপনি আপনার কাজগুলোতে পিছিয়ে যাচ্ছেন!

আসলেই কি প্রতিদিনের কাজকর্মগুলো জমিয়ে না রেখে সেরে ফেলা খুব জরুরি? আমাদের সম্পর্কগুলোর ভয়াবহ বিপর্যয়ের যাত্রা কি এই নগণ্য অলসতার হাত ধরেই শুরু হয়?

বিভিন্ন আঙ্গিকের অলসতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রতিদিনকে সব দিক থেকে যথাসম্ভব সুন্দর করার জন্য করণীয় সব কাজকর্মের প্রতি আরেকটু নজর দেয়া যায় কি না? অলসতার অনুভূতি আপনার দুর্জয় ক্ষমতাগুলোকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে না তো? অলসতা দীর্ঘমেয়াদে যে আপনার ওপর বাজে প্রভাব ফেলছে, তা আপনি ধরতে পারছেন?

ইসলামে অলস মানুষদের নিন্দা জানানো হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ
احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ

'আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে অধিক উত্তম ও প্রিয়। তবে (মুমিনদের) প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি ওই জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন (অক্ষম) হয়ো না।'[১০]

অলসতা দূর করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ শিখিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

'হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের আজাব থেকে।

হে আল্লাহ, আপনি আমার মনে তাকওয়ার অনুভূতি দান করুন, আমার মনকে পবিত্র করুন। আপনিই তো আত্মার পবিত্রতা দানকারী। আপনিই তো হৃদয়ের মালিক, অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ, আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে, যে ইলম কোনো উপকার দেয় না; এমন হৃদয় থেকে, যে হৃদয় বিনম্র হয় না; এমন আত্মা থেকে, যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না; এবং এমন দুআ থেকে, যে দুআ কবুল হয় না।'[১১]

অন্য হাদীসে আছে, তিনি দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।'[১২]

---

১০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪
১১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২২
১২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৯৩

৬. রাগ হচ্ছে কেন? আর রাগ দেখাচ্ছি কোথায়?

ধুমধাম করে দরজা লাগাচ্ছি!

থালাবাসন ধুয়ে ঝুড়িতে এত জোরে রাখছি যে, ঝনঝন শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে পুরো বাড়ি।

বাচ্চা এসে বরাবরের মতো স্বাভাবিকভাবে কোনো আবদার করল, দুইটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম।

কারণ কী? বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা কোনোভাবে ক্যান্সেল হয়েছে! তাই আমার সাধ্যের মধ্যে যত উপায় ছিল তার সাহায্যে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছি।

যে কারণে রাগ হয়েছে সেটা না বুঝে বা সে ক্ষেত্রে রাগের বহিঃপ্রকাশ না করে অন্যভাবে প্রকাশ করা অনেকেরই অভ্যাস।

রাগের কারণ ঘটেছে এক জায়গায় আর রাগ দেখাচ্ছি আরেক জায়গায়— নিঃসন্দেহে একটা বড় ভুল!

দেখা গেল রাগ হয়েছে শাশুড়ির কারণে, প্রয়োগ করছি বাচ্চাদের ওপর। সামনে যে আসছে বকাঝকা করছি, চিল্লাচ্ছি, বাচ্চাদের মারধর করছি; কিন্তু এদের ওপর আমার কোনো রাগই নেই। রাগের গলায় কিছুতেই দড়ি পড়াতে পারছি না, রাগই আমার গলায় দড়ি পড়িয়ে আমাকে ঘোরাচ্ছে। গল্পগুজব বা আড্ডাগুলোতে অনেক আপুই এভাবে বলেন।

খুব কম মানুষই আছেন, যারা তাদের রাগের প্রভাবকে বেডরুম পর্যন্ত ঢুকতে দেন না। বাইরের যেকোনো উৎস থেকে রাগ হচ্ছে, আর এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আপনি একের পর এক অ্যাঙ্গার এপিসোড ঘটিয়ে যাচ্ছেন। সবার প্রথমে আপনি নিজে কষ্ট পাচ্ছেন, সবাই আপনাকে রাগী ভাবছে, কিন্তু আপনি রাগী হতে চাননি।

নিজের রাগটা বুঝতে না পারাটা একটা ব্যর্থতা আর নিজের রাগটা বুঝতে না চাওয়াটা আরেক ভুল সিদ্ধান্ত।

রাগ আমাদের একটা স্বাভাবিক আবেগ। আবেগকে কখনো নষ্ট দেয়া যায় না। আবেগের বহিঃপ্রকাশ যেন যথাযথ হয়, রাগের ভারসাম্যহীনতায় নিজের

সম্ভাবনাগুলো যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সে জন্য রাগ এর উৎপত্তিস্থলগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা চাই, এরপর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. অমুক ভাবির এটা আছে, অমুক ভাবির এটা নেই

বিয়ের পর অনেকের মধ্যে কিছু কিছু চাহিদা প্রবল হয়ে ওঠে! অমুক ভাবির বাসায় গিয়েছিলাম, তাদের অমুক জিনিসটা আছে, আমার ওইটা লাগবে। এটা ছাড়া আমার চলবেই না, সেটা আমার চাই। তাদের সেই জিনিসটা আছে, আর আমার থাকবে না তা কি হয়!

আবার অমুক ভাবির এই জিনিসটা নেই, তার মানে এই জিনিসটা আমার লাগবে। এই জিনিস যদি আমার থাকে, তাহলে আমি ভাবির চেয়ে এগিয়ে যাব। আরেকজনের থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার এটা একটা সহজ পথ—তার যা নেই তা আমার থাকতে হবে! চিন্তা করা যায় কী অসুস্থ প্রতিযোগিতা!

বলুন তো, বিভিন্ন জিনিসের প্রতি চাহিদা তৈরির পেছনের কারণ কী—লোক-দেখানো, রুচিশীল প্রয়োজন নাকি অসুস্থ প্রতিযোগিতা? কী কারণে আমরা কোনো জিনিস কিনি? আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা কি অন্য ভাবির 'জিনিসপত্র' নির্ধারণ করে দিচ্ছে?

অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো, এই ধরনের চাহিদা পূরণ না হলেও আমাদের ভীষণ মন খারাপ হয়, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সংসারের কোনো কাজে মন বসে না, আরও কত কী!

অনেকেই নতুন সংসার শুরু করার পর যা যা প্রয়োজন সেটা অন্যান্য ভাবিদের হাতে ছেড়ে দেন! মাপকাঠি বানান ভাবিদের জিনিসপত্রকে! নিজের রুচিবোধ, ব্যক্তিত্ব, আয়, প্রয়োজন ইত্যাদিকে সামনে রেখে চাহিদা বা পছন্দ নির্ধারণ করছি কি না? আপনি পরামর্শ নিতে পারেন, তাই বলে ওই রঙের, ওই ব্র্যান্ডের, ওই জিনিসই আপনার লাগবে! এসব কি প্রতিযোগিতা করার মতো কোনো বস্তু? জুলুম হয়ে যায় না?

৮. বাচ্চার দেখাশোনার জন্য শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা

অনেকেরই আফসোস, আমার শাশুড়ি যদি আমার ছেলেমেয়েদের একটু দেখত, তাহলে ক্যারিয়ারটা আমার এমন হতো না!

সংসারের কাজের চাপে বাচ্চার খাওয়ানোর সুযোগ পাচ্ছি না, একটু খাইয়ে দেবে না!

অনেকে আবার শাশুড়ির কাছে বাচ্চা রেখে নিজের কাজে যান। ফিরে এসে যখন দেখেন, বাচ্চার যত্নে কোনো কমবেশি হয়েছে, তখন রাগে বিরক্তিতে গজগজ করতে থাকেন।

আপনার বাচ্চা পালনের দায়িত্ব কি আপনার শাশুড়ির?

উনার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, উনি তো সবকিছু করেই এ পর্যায়ে এসেছেন; বরং উনার পরিমিত বিশ্রাম হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে আপনার খেয়াল রাখা উচিত। উনারা সুস্থ থাকলে আপনারই মঙ্গল।

আপনি এখন আছেন আপনার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী সময়ে। এ সময়ে বাচ্চা সামলানো, সংসার, আত্মীয়-স্বজন, ব্যক্তিগত কাজকর্ম সবকিছু সমানতালে এগিয়ে নেয়া আপনার জন্য কোনো ব্যাপারই না। কেন মনে করছেন আপনার শাশুড়ি সাহায্য না করলে আপনি সামনে এগোতে পারবেন না? সব মানুষ তো এক রকম না!

ঠিক, আশেপাশে মানুষের সাহায্য-সহায়তা থাকলে কাজ করা সহজ হয়। কিন্তু এসব সহায়তা না থাকলে আপনি দমে যাবেন? আপনি কি আপনার স্বপ্ন পূরণে অন্যের মুখাপেক্ষী?

৯. বাবার বাড়ির গল্পে মুখরিত থাকা

বাবার বাড়ি নিয়ে মুখরিত বউ-মাদের কয়েকটা ক্যাটাগরি দেখা যায় :

বাবার বাড়ির অতীত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ এবং তারা এ কারণে গর্বিত, আত্মতৃপ্ত, কিছুটা অহংকারী।

আরেক ক্যাটাগরি, তাদের বাবার বাড়ির অতীতটা ততও সমৃদ্ধ না, কিন্তু ভবিষ্যতে হবে সেই দিবা-স্বপ্ন দেখেই আত্মতৃপ্ত ও অহংকারী।

আরেক ক্যাটাগরি, অতীত যেমনই হোক তাদের বাবার বাড়ির বর্তমান অবস্থা ভালো, ভাই-বোন, মা-বাবা পরিশ্রমী এবং সেই গর্বেই বোন আত্মতৃপ্ত, অহংকারী।

আরেক ক্যাটাগরি, এত ভাবাভাবি বোঝাবুঝির সময় নেই, যা বলতে ইচ্ছা করছে বলছি, জানি তাই বলছি! অহংকার করছি নাকি তৃপ্তি পাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না! যেহেতু বাবার বাড়িতে এতদিন থেকেছি, এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, এ নিয়ে একটু বেশিই বলছি! অনেকে তো আছে, শ্বশুরবাড়িতে এসে তার বাবার বাড়ির মানুষদের সম্পর্কে জানানোর জন্য প্রায় প্রতিটা প্যারাতেই বাবার বাড়ি সম্পর্কে দু-একটা বাক্য বলেন।

ভাবিদের আড্ডায়, গল্পে বাবার বাড়ির গুণগানে মুখরিত থাকে! যাদের কথাবার্তায় বারবার আমি আমার আমাদের এই শব্দগুলো আসে; যারা নিজেদের নিয়ে অতিমাত্রায় তৃপ্ত, তাদের অধিকাংশই সাধারণত অহংকারী, কিছু অংশ নির্বোধ টাইপেরও হয়। কথার মধ্যে বারবার ভেসে আসে, আমার বাবার প্রভাব এত, আমার ভাইয়েরা এই, আমার স্ট্যাটাস ওই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যি কি জানেন, আপনার গল্প কে শুনতে চায়? কেউ তো অন্যের গল্প শুনতে চায় না। আগ বাড়িয়ে নিজের গুণকীর্তন করে অন্যের বিরক্তির কারণ কেন হবেন? জমিনের চারাগাছ যখন মহিরুহে পরিণত হয়, লোকে আপনি তা দেখতে পায়।

বাবার বাড়ির ঐতিহ্য, বংশের গৌরব গল্প করে বলতে যাবেন কেন? বংশীয় বাড়ির মেয়ের মতো দেখিয়ে দিন—শৃঙ্খলা আর ভালো অভ্যাস কীভাবে আপনার পূর্বপুরুষকে সমৃদ্ধ করেছে। যেসব কাজ আপনাদের অতীতকে সফল করেছে, তা দৃঢ়তা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে আপনিও বয়ে বেড়াচ্ছেন, তা দেখিয়ে দিন।

হিসেবের খাতা খুলে চোখ বড় বড় করে আরেকবার তাকিয়ে দেখা যাক—অতীতের সফলতার গল্প আপনাকে ধোয়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে কি না? ব্যর্থতার কারণ আপনার সাফল্য না তো?

১০. সংসার ও ব্যক্তিগত কাজের মাঝে গুরুত্ব নির্ণয় করতে না পারা

বাচ্চার হাতেখড়ি শেখার জন্য বাসার কাছে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি করেছিলাম। বিকেল ঠিক না, দুপুরের পর সাড়ে তিনটার দিকে ওদের নিয়ে

যেতাম। বেশ কয়েকটা বাচ্চা মায়েদের হাত ধরে পড়তে আসত। ওদের সাথে আরও দুইটা বাচ্চা পড়ত। ওদের দাদি ওদের কোচিংয়ে আনা-নেয়া করত। উনার বয়স ৬০ থেকে ৬৫ হবে। কোনো একদিন উনাকে বলেছিলাম, নাতি-নাতনিদের আপনি অনেক আদর করেন, দুপুরের পর বিশ্রাম না নিয়ে প্রতিদিন ওদের নিয়ে আসেন।

সাধারণত দাদা-দাদি বা নানা-নানি যদি নাতি-নাতনিদের স্কুলে নিয়ে যায় আর কেউ তাদের কেয়ারিং grandparents হিসেবে বাহবা দেয়, তবে উনারা খুব খুশি হন, চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক দেয়, এরপর পাঁচ থেকে দশ মিনিট ধরে নাতির গুণগান বা দুষ্টুমির বর্ণনা দেন। কিন্তু উনি বড় এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, আর আরাম! দেড় বছর থেকে ওদের সব দেখাশোনাই তো আমি করি। ওর মা গেছে পিএইচডি করতে বেলজিয়ামে। এক বছর পর ১৫ দিনের জন্য একবার এসেছিল। আবার কবে আসবে জানি না। তবে প্রতিদিন ওর মা বাচ্চাদের সাথে কথা বলে। এদিকে ওর বাবার ট্রান্সফার হয়েছে অন্য এক জেলায়। প্রতিসপ্তাহে এক দিনের ছুটিতে আসে ঢাকায়। ছুটি শেষ হলে আবার চলে যায়। আমি আর এদের কোথায় ফেলে যাব।

ওইদিন কথা ওই পর্যন্তই।

আরও দেড় বছর আমার বাচ্চা ওই কোচিংয়ে পড়েছিল, ওই বাচ্চাগুলোও পড়ত। শেষের দিকে শুনেছিলাম সংসারটা আর টেকেনি।

আমার এক আত্মীয় আছেন। অনেক আমল করেন। ফজরের পর থেকে কোনো দিকে না তাকিয়ে সারা দিনের সমস্ত নফল আমল শেষ করে সকাল সাড়ে আটটা-নয়টার দিকে ওঠেন। উনার ছোট ছোট বাচ্চা আছে, স্বামী অফিসে চলে যান আটটায়। প্রায় দিনে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাঁধে এই নিয়ে যে, স্বামী বলে, কুরআন তিলাওয়াতটা আমি অফিসে চলে গেলেও করতে পারো, নাস্তা গুছিয়ে রেখে ফ্রি হয়ে আমলে বসতে পারো। স্ত্রী বলে, কেমন মানুষ তুমি! কুরআন তিলাওয়াতের মতো নেক আমল করতে বাধা দাও! দ্বীন আগে না দুনিয়া আগে?

দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্যই আমি আমার ক্যারিয়ারের একবিন্দু কম্প্রোমাইজ করব না। এই তুচ্ছ সংসারের জন্য আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করব—হতেই পারে না। সংসার ছাড়তে পারব, চাকরি ছাড়তে পারব না।

আসলে কি, গুরুত্বের দিক দিয়ে কাজকে ভাগ করা—কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কোনটি আগে করব আর কোনটি পরে করব সেই সিদ্ধান্ত নেয়া খুব জরুরি একটি বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবারের মাঝে সুসংঘটিত সমন্বয় না করা বিবাহিতার একটি ভুল।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকে নজর দেয়া হয় সাধারণত পরিবারকে উন্নত করার জন্য। পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়; কারণ তারা পরিবারের মাঝে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে পারে। একার শক্তি সব সময়ই নাজুক। একা অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। নিজেকে কেন একা রাখবেন? আর দিনশেষে আপনি একা থাকতেও পারবেন না। আপনার মানুষ লাগবে, মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক লাগবে।

যখন আপনার আরেকটু বয়স হবে, তখন যে জিনিসটি আপনাকে সবচেয়ে খুশি রাখবে তা হলো, মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক। আপনি একা থাকতে পারেন কি না, একা থাকা সুখের কি না! চিন্তা করুন। একা একা এগিয়ে যাবেন নাকি সবাইকে নিয়ে একসাথে এগোবেন?

দেখুন, আপনার ব্যক্তিগত উন্নয়নের হেতু যদি পরিবারকেই বোঝাতে না পারেন, তবে কাকে বোঝাতে পারবেন? যদিও সবাই বুঝবে না, অনেকে বুঝলেও মুখে স্বীকার করবে না। তারপরও সর্বোচ্চ চেষ্টা তো করতে হবে।

পরিবারকে ছেড়ে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পেছনে না পড়ে বরং পরিবারকে সাথে নিয়ে সবাই একসাথে উন্নত হওয়া যায় কি না?

সময় বা পরিস্থিতিসাপেক্ষে কাজের গুরুত্ব যে পরিবর্তন হয়, তা বুঝতে না পারা আমাদের একটা সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন?

১১. শাশুড়ির স্নেহের অংশীদার হতে নিজেকে মেয়ের মতো মনে করা

ধরুন, মেয়ে ও বউ-মা দুজনেই সন্তানসম্ভবা। মেয়ে যখন খাবার পরে ওয়াক ওয়াক করতে করতে ওয়াশরুমে যায় তখন বাড়ির প্রায় সবাই পিছনে ছোটে! একজন পিঠে হাত রাখে, আর একজন মাথায় পানি দেয়, আরেকজন হাত ধরে এনে বিছানায় শোয়ায়, যেটা খেতে রুচি হয় সেটা খাওয়ায়! কিন্তু সন্তানসম্ভবা

বউ-মা যখন বমি করে তখন সচরাচর কেউ পিঠে হাত রাখে না, পানির ঝাপটা দেয় না, বাড়ির মানুষেরা তেমন একটা উতলা হয় না, পছন্দের খাবার রেঁধে সামনে দেয়া হয় না! বরং বলা হয়, বাচ্চা পেটে আসলে একটু কষ্ট সবারই হয়!

ছেলে বা বউ-মা উভয়েরই হয়তো চিকনগুনিয়া হয়েছে! হন্তদন্ত হয়ে ছেলের কপালে হাত দিচ্ছে, আঁতকে উঠছে, দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে বলছে, আহারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! বউ-মার কপালে হয়তো হাত দেয়ার সময়টা শাশুড়ির হচ্ছে না; বরং শাশুড়ি বউ-মার দিকে তাকিয়ে বলছে, ওর দিকে একটু খেয়াল রেখো।

বউ-মার মনে হয় শাশুড়ি তাকে মেয়ের মতো বলে কিন্তু ছেলে-মেয়েকে সে কত ভালোবাসে। আর আমাকে? শাশুড়ি ভালোবাসতে পারে না তা না, সে আসলে আমাকে ভালোবাসে না!

কথা হলো, শাশুড়ি কেন আপনাকে সন্তানের মতো ভালোবাসবে? কীভাবে বাসবে? আপনি তো তার সন্তান না, ছেলের বউ। আপনার শাশুড়ি আপনার স্বামী, দেবর, ননদ সবাইকে যেভাবে ভালোবাসবে কখনোই আপনাকে সেভাবে ভালোবাসতে পারবে না। আপনি তার নাড়িছেঁড়া কেউ নন। তাঁর সন্তান তাঁর আনন্দের কারণ, বেঁচে থাকার অবলম্বন। আপনিও যখন আস্তে আস্তে তাঁর আনন্দের কারণ, নির্ভরশীলতার আশ্রয় হয়ে উঠবেন তখন আপনার প্রতি স্নেহ-মমতা তার আপন সন্তানের কাছাকাছি হতে পারে।

শাশুড়ির চোখে তার সন্তানসম স্নেহ খুঁজতে যাওয়া বিবাহিতার ভুলগুলোর মধ্যে একটি।

১২. পারিবারিক নিয়ম মানাকে পরাধীনতা মনে করা

- কেন প্রতিদিন রাতে একসাথে খেতে হবে? এটা আবার কেমন হুকুম! প্রতিদিন সবাই মিলে একসাথেই খেতে হবে! আমি আমার ইচ্ছামতো যখন-তখন খেতেও পারব না?
- আমার বাইরে যাওয়া দরকার, যাব। কেন বাসায় বলতে হবে? আমি তো আর অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি না। সব সময় এত পারমিশন নিতে পারব না।
- প্রতিবারই কেন গ্রামের বাড়িতে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে? ঈদের সময় কী

একটা পরিস্থিতি হয় রাস্তার, এর মধ্যেও যেতেই হবে। কী ফালতু একটা পারিবারিক নিয়ম!

- শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি মিটিংয়ে ছেলে-মেয়ে ছাড়া কোনো বেটার বউ থাকতে পারবে না। এটা কোন ধরনের সিস্টেম? ছেলের বউরা তো ফ্যামিলিরই সদস্য। বাড়ির বাইরের কেউ তো না।

পারিবারিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক বউ-মা এভাবে মন্তব্য করেন। শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে থাকার সময় যেমন এ সমস্ত নিয়ম থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারেন না, তেমনি একক পরিবারে থাকার সময়ও আপনি পারিবারিক নিয়মগুলো অবহেলা করতে পারেন না।

যাই হোক, আপনার আশেপাশেই এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে তাকালেই এই ধরনের কিছু ছোটখাটো নিয়ম চোখে পড়বে। এই পারিবারিক নিয়মগুলো সকলের খুব যত্নের, পরিবারের সদস্যরা এগুলোর প্রতি একধরনের মায়া বা দুর্বলতা অনুভব করে।

এখন পরিবারে নতুন বউ আসার পরে সে যদি এসব নিয়ম মানতে না চায় বা নিয়মগুলোর প্রতি অবহেলা দেখায়, তার অবহেলাপূর্ণ আচরণ পরিবারের সবার মনেই কষ্ট দেয়। মোটামুটি সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারগুলোতে এসব আচরণের ফলে মনকষাকষি খুব বেশি হয়।

আর বউ-মা এ ধরনের বিষয়গুলোকে পরাধীনতা মনে করে। মনে মনে ভাবে, বিয়ে-শ্বশুরবাড়ি তার সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সে এখন আর আগের মতো যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে না। অনেক বউ-মা আক্ষেপ করে বলেন, এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আগে কি সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারত? আমরা নিজেদের স্বাধীন বলে যে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করি, আসলে আমরা কতটুকু স্বাধীন?

ধরুন, আপনার ইচ্ছা হলো রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে বা খোলা আকাশের নিচে সবুজ মাঠ চিরে চলে যাওয়া রেললাইনের ওপর বসে থাকতে। পারবেন না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়েও আপনি তা পারবেন না। বাক-স্বাধীনতা আছে বলেই আপনি যখন যাকে ইচ্ছা যা খুশি তা-ই বলতে পারবেন না।

এই আপনি যখন ছাত্রী ছিলেন তখন মাদরাসা বা স্কুলের নিয়ম মানাকে পরাধীনতা মনে করতেন না, নিয়মানুবর্তিতা মনে করতেন। প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে যেতেন, যা খুশি তা-ই পরে যেতেন না। আবার বান্ধবীদের গেট-টুগেদারে সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—সবাই একই রঙের শাড়ি পরবে, আপনি তখন নিজের শাড়ি না থাকলে অন্যের শাড়ি ধার করে হলেও পরেন। এটা কি পরাধীনতা? তখন মনে হয় না যে, বান্ধবীরা আপনার স্বাধীনতা নষ্ট করছে।

আপনার নিজের স্বাধীনতাগুলো উপভোগ করার জন্যই আপনি বিভিন্ন পরাধীনতাকে মেনে নেন, তাই না? তেমনি শ্বশুরবাড়ির নতুন পারিবারিক নিয়মগুলো এ রকমই। কিছু ভালো লাগবে কিছু ভালো লাগবে না। তারপরও নিজের ভালো থাকার জন্য এই নিয়মগুলো একটু আগে-পরে করে মেনে নিতে হবে।

আপনি হয়তো শ্বশুরবাড়িতে অনেক বড় বড় অবদান রাখছেন। কিন্তু আপনার এই ছোট ছোট অনীহা হয়তো বড় অবদানগুলোকে মাটি করে দিতে পারে। মাঝে মাঝে এমন হয়, কিছু বড় বড় সিদ্ধান্তে ছাড় পাওয়া গেলেও কিছু ছোট ছোট ক্ষেত্রে পরাধীনতা থেকেই যায়। এটাই স্বাভাবিক।

শাশুড়ি হিসেবে আমাদের কিছু ভুল

এই চ্যাপ্টারে শাশুড়ি-মায়েদের ভুলগুলো তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আলোচনা করা হয়নি। উনারা নিঃসন্দেহে সম্মানের উপযুক্ত, তাদের খেদমতের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। উনারা সকল পরিস্থিতিতে ছেলে, বউ, নাতি-নাতনি সবার ভালোই চান। ভালো চাওয়ার এই পদ্ধতি হয়তো একেকজনের একেক রকম। তবে উনাদের সবকিছুর পেছনে আছে একবুক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

এ ক্ষেত্রে জরিপের সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রায় শ'খানেক বউ-মাদের কাছ থেকে তাদের শাশুড়ি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। শাশুড়ি-মায়ের কোন কোন বিষয় তাদের সবচেয়ে খারাপ লাগে, কোন কোন গুণ তাদের আকৃষ্ট করে ইত্যাদি। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বললেও ক্যাটাগরাইজ করলে অল্প কিছু ভুল সাধারণভাবে পাওয়া যায়; সেগুলোই এখানে নেয়া হয়েছে।

পাশাপাশি বেশ কিছু ইংরেজি বইয়ের সাহায্য নিয়েছি, যেগুলো অধিকাংশই সাইকোলজিস্টদের লেখা। এ ছাড়া আমাদের দেশের কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কেস স্টাডিতেও এই ধরনের ভুলগুলোই বারবার উঠে এসেছে।

আগামী দিনের শাশুড়িদের জন্য এই চ্যাপ্টারটি লেখে হয়েছে, যারা আজকের বউ-মা।

১. বউকে কড়া শাসনে না রাখলে মাথায় চড়ে বসবে

ছেলের বউ ঘরে পা দেয়ার সাথে সাথে কিছু কিছু শাশুড়ি-মায়ের মাথার মধ্যে

একধরনের অদ্ভুত চিন্তা খেলে যায়। আর তা হলো, যেকোনো উপায়েই হোক বউ-মাকে হাতের মধ্যে রাখতে হবে। তাদের মনে একধরনের আশঙ্কা হয়— এখন যদি বউ-মাকে হাতের মধ্যে না রাখতে পারি, তাহলে বউ-মা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার দুঃসাহস দেখাবে! তাকে হাতের মধ্যে নেয়ার এটাই মোক্ষম সময়। বউ হাতে থাকা মানে ছেলেও হাতে থাকা। আর বউকে করতলগত করার সহজ উপায় হলো তাকে কড়া শাসনের মধ্যে রাখা। হয়তো এই শাশুড়ির যিনি শাশুড়ি ছিলেন তিনিও তাকে এই উপায়েই হাতের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছিলেন!

সুযোগ দিলে মাথায় চড়ে বসবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে কড়া শাসনের মধ্যে রাখতে চান। কিন্তু ব্যাপারটা সব সময় এভাবে কাজ করে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো দমিয়ে রাখা যায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নতুন সংসারে সে একেবারে আনাড়ি, আস্তে আস্তে তার শক্তি বাড়তে থাকবে, সন্তান-সন্ততি হওয়ার মাধ্যমে জনবল বাড়বে, তখন সুযোগ পেলেই তার এই চাপা ক্ষোভ বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে।

বিয়ের পর বউ-মা যখন শ্বশুরবাড়িতে আসে, তখন সে তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-আচরণ সবকিছু সঙ্গে নিয়ে আসে। শাশুড়ি যদি বউ-মাকে বোঝাতে পারে যে, শাশুড়ির আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, আচরণ অনেক বেশি কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি এবং বউ-মার জন্য উপকারী, তাহলে বউ-মা ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলোর সাথে আপনা-আপনি খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। শাশুড়ির ভালো ব্যবহার, আন্তরিক আচরণ থেকে যে বউ-মা শাশুড়ির প্রতি আনুগত্য করা শেখে না, তাকে কড়া শাসনের মধ্যে রেখেও আনুগত্য শেখানো যায় না। ড্যামকেয়ার টাইপের বউ-মা আছে, তাদের ছেড়ে দেয়াই ভালো; তারা একসময় ঠেকে শিখবে।

কিন্তু ড্যামকেয়ার বউ-মা এবং যারা অনুগত বউ-মা তাদের উভয়কে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই শাশুড়ি যদি কড়া শাসনের উপায়গুলো বেছে নেন, তবে এটা শাশুড়ির একটা ভুল। কাউকে ইশারায় শেখানো যায় আবার কাউকে মেরে বকেও শেখানো যায় না। সব ধরনের মানুষকে শেখানোর পদ্ধতি এক না; বরং ভিন্ন ভিন্ন।

আমরা ইসলামের শিক্ষা থেকে জেনেছি, আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খেদমতে থাকা আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দশ বছরের মধ্যে কোনোদিনও বকা দেননি, কোনোদিনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কোনো কথা

বলেননি।[১৩] তারপরও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের ওপর কর্তৃত্ব করেছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুধু আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু না, সকল সাহাবায়ে কেরামের কলিজার মধ্যে ছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি, উহুদের যুদ্ধে যখন প্রিয় রাসূলের দাঁত মোবারক শহীদ হয় তখন নবীজী আবু আমের আর রাহিবের করা একটি গর্তে পড়ে যান, তাঁর মাথা ফেটে যায়। এতে তার শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া চেহারায় ঢুকে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কড়া দুইটি বের করার জন্য সামনে অগ্রসর হলে হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. তাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহর জন্য এই খেদমত আমাকে করার সুযোগ দিন।

এই বলে তিনি হাতের পরিবর্তে নিজের মুখ দিয়ে সজোরে টান দিতেই কড়া বের হয়ে আসে। সাথে সাথে টানের তীব্রতায় আবু উবাইদা রাযি.-এর একটি দাঁত উপড়ে যায়। দ্বিতীয় কড়াটিও মুখ দ্বারা টান দিলে আরেকটি দাঁত উপড়ে যায়।[১৪]

এই যুদ্ধে কাফেরদের কাছ থেকে উড়ে আসা তির থেকে নবীজীকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে ঢাল হিসেবে পেতে দিয়েছিলেন আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।[১৫] হযরত আবু তালহা রাযি. একটি ঢাল হাতে নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় তার শরীরে ৭০ এর বেশি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন।[১৬]

এমন কত ঘটনা রয়েছে নবী-প্রেমের! এত ভালোবাসা, এতগুলো মনকে কীভাবে জয় করেছিলেন একজন মানুষ? প্রশ্ন জাগে। এক ছেলের বউয়ের মনের ওপর কর্তৃত্ব করতে আমরা কতশত চিন্তা করছি! বরং ভালো হতো না— ভুলভাল চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে সেসব কার্যকর পদ্ধতিগুলো জেনে নেয়া, যে পদ্ধতি আজাদ মানুষদের গোলামে পরিণত করে? সেসব উপায়

---

১৩. আনাস ইবনু মালিক রাযি. বলেন, "আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আমাকে উহ শব্দও বলেননি এবং কোনো সময় আমাকে 'এটা কেন করলে, ওটা কেন করোনি' তাও বলেননি।"-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৯

১৪. মুসতাদরাকু হাকিম, হাদীস নং ৫১৫৯। ইমাম হাকিমের মতে সনদ সহীহ। তবে ইমাম জাহাবী সনদে কিছুটা আপত্তি করেছেন। তবে এই ঘটনা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত।

১৫. ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর, ৮/৩১৪। সনদ হাসান।

১৬. মুসতাদরাকু হাকিম, হাদীস নং ৪৩১৩। সনদ সহীহ।

জেনে নিলে ভালো হতো না, যেভাবে কড়া শাসন ছাড়াই বউ-মার আন্তরিক শ্রদ্ধা পাওয়া যাবে?

২. মা-ছেলের ভালোবাসায় ভাগ বসাতে এসেছে বউ

'ছেলের বিয়ে দিতে হবে' এই ভাবনার পরের চিন্তাগুলো অনেক সময় এমন হয়—'ছেলে আর আমার থাকল না', 'এত কষ্টে বড় করলাম, কিন্তু এখন পর হয়ে যাবে', 'বাইরের কাজ সেরে বাসায় এসে আর আমাকে সময় দেবে না', 'ওর যা দরকার, তা আমাকে না বললেও চলবে'। এমন হাজারো আশঙ্কা আসে হবু শাশুড়ির মনে। পাড়া-প্রতিবেশী, পাশের বাসার আপাও হবু শাশুড়িকে সতর্ক করেন—'আপা ভালো মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দিয়েন, অমুকের বউ-মা ভালো বংশের মেয়ে, কিন্তু কী যে দজ্জাল, সাক্ষাৎ ডাইনি! শ্বশুরবাড়িতে পা দিতে-না-দিতেই ছেলেকে আলাদা করে ফেলেছে!'

হবু শাশুড়ির মনের কোনায় ভয় ঢুকে যায়। আশঙ্কা হয়, হয়তো এমন কোনো এক ডাইনিই আসবে আমার ঘরে, কেড়ে নেবে আমার আগলে রাখা ছেলেকে। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—ওর বাবা কী সুন্দর সারা দিন কাজের ব্যস্ততা শেষে বাড়ি ফিরে সন্তানের আধো বোলে ছড়া শুনে খুশি হয়ে তাকে একটা চকলেট দিয়েই তৃপ্তির ঘুম দিত। অথচ ওই চার লাইনের ছড়াটা সন্তানকে শেখাতে ছেলের পেছনে দৌড়ে সারাদিন শেষ করে দিয়েছে মা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্ট বাচ্চা খায় না; জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ বাচ্চাটা প্লেটের সব খাবারটুকু খেয়েছে; পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে। জীবনের পুরোটাই নিয়োজিত এই সন্তানের জন্য। মায়ের পুরোটা জীবন, শারীরিক-মানসিক সকল প্রকার শ্রম বিনিয়োগ করা হয়েছে সন্তান লালন-পালনের পেছনে। সেই ছেলেকে যে কেড়ে নেবে, সে সাক্ষাৎ ডাইনি ছাড়া আর কিছুই না।

তাই মাঝে মাঝে হবু শাশুড়ির মনে হয়, থাক, বিয়ে যত দেরিতে হয় ততই ভালো। বউ ঘরে আসলেই বিপদ। বিয়ে দিলে তো বউ এমনি এমনি আসবে না, তার সমস্ত অধিকার নিয়েই সে আসবে। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম সবকিছু তাকে অধিকার দিতে বলবে। পানির গ্লাস, থালা, বাটি, বিছানার চাদর, ঘর—সবকিছুতে অংশীদার হবে। এমনকি ছেলের ভালোবাসাতেও। হবু শাশুড়ির মনে হয়, সংসারের হাজারো সমস্যার মাঝে শুধু সন্তানের ভালোবাসাকে আগলে ধরে বেঁচে

থাকি। আমি কীভাবে আমার ভালোবাসাকে হাতছাড়া করব? এই ভালোবাসার যে অংশীদার হবে, সে কীভাবে আমার আপন হতে পারে? হয়তো এ কারণেই বউ-মাকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গুনতে শাশুড়ির খুব কষ্ট হয়। এ কারণেই হয়তো বউ-মার গুণগুলোও দোষের মনে হয়।

আপনি হয়তো বলবেন, কিছু কিছু বউ-মা আসলেই ডাইনি টাইপের। অবশ্যই। কিন্তু ওই কিছুর কারণে তো সবাইকে ডাইনি বলা ঠিক হবে না।

তবে এখানে চিন্তা করার মতো আরও একটি বিষয় আছে। ছেলের বিয়ে দেয়ার আগে মা যখন পাশের বাসার ভাবিদের বলেন, 'ভাবি, আমার ছেলের জন্য মেয়ে দেখেন, ওর বিয়ে দেব।' তখন পাশের বাসার ভাবিরা খুব কমই বলেন, 'জানেন ভাবি, অমুকের বউ-মা যা লক্ষ্মী! ঘরে এসে শাশুড়ির কাঁধের বোঝা একেবারে হালকা করে দিয়েছে।' ভালো কথাগুলো কমই ছড়ায়।

আমরা আমাদের খারাপ দিকগুলো নিয়ে যতটা কানাঘুষা করি বা জটলা বাঁধি, মেতে উঠি, ভালো দিকগুলো নিয়ে ততটা কথাবার্তা বলি না। বউ-মাকে ঘরে আনার আগে শাশুড়ি-মা নিজের অভিজ্ঞতা বা পাশের বাসার ভাবির গল্প গুজব থেকে বিশ্বাস করে নেন—'আমার বউ-মা এসেও হয়তো আমার ছেলেকে কেড়ে নেবে, আমার ছেলে তখন আর আমার সাথে হেসে গল্পগুজব করবে না।' মনের মাঝে এসব দৃশ্য তিনি আগেই একে ফেলেন। এরপর যখন ঘরে বউ আসে তখনো মনের মধ্যে আগ থেকে একে রাখার দৃশ্যপটকে সামনে রেখেই বউ-মার সাথে আচরণ করতে থাকেন। ছেলে চিন্তা করতে থাকে, মা এমন হয়ে গেল কেন? কেন আমার বউকে ভালোবাসে না? মা তো এমন ছিল না! ছেলে আর আগের মতো স্বচ্ছন্দে মায়ের সাথে হাসাহাসি, গল্প করতে পারে না। বউ-মা ভাবে, শাশুড়ি কী কড়া, কী সন্দেহপ্রবণ! আর শাশুড়ি ভাবে, ঠিক যা ভেবেছিলাম! ঠিক আমার ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কোনো জাদুটোনা করেছে এই ডাইনিটা। তা না হলে আমার ছেলে তো এমন ছিল না!

তবে হ্যাঁ, সব শাশুড়ি একরকম না। পাশের বাসার ভাবিদের উস্কানিতে সবাই ভেসে যান না। সবাই বাস্তবটা বুঝতে ভুল করেন না। তারা জানেন, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর সন্তানের বিয়ে দেয়া বাবা-মায়ের বড় একটি দায়িত্ব। তারা জানেন এটা মহান প্রভুর আদেশ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও।' [১৭]

তারা জানেন, ভালোবাসা কোটাভিত্তিক। একজনকে ভালোবাসলে আর একজনকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মায়েরা সন্তানকে ছোটবেলাতেই শিখিয়ে দেন—নানিকে ভালোবাসতে হলে দাদিকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। খালাকে ভালোবাসলে ফুফুর প্রতি বিদ্বেষ রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

সব সন্তানই জীবনের শুরুর দিকে বাবা-মায়ের ওপর চরম পর্যায়ের নির্ভরশীল থাকে। ধীরে ধীরে সে স্বাবলম্বী হয়, তার জীবনসঙ্গীর প্রয়োজন হয়। মায়ের স্নেহ ভালোবাসা এক ধরনের, স্ত্রীর ভালোবাসা আরেক ধরনের আর সন্তানের ভালোবাসা ভিন্ন ধরনের। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের মনের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন এসব ভালোবাসার চাহিদা তৈরি হয়। এসব বাস্তবতার সাথে যে মা যত তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নেন, তিনি তত তাড়াতাড়ি তার নিজের, সন্তানের ও সমাজের উপকার করেন।

ভালোবাসায় কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, তা যদি কোনো মা তার সন্তানকে শিখিয়ে না দেন, তবে ঘরে বউ আনার আগেই সন্তানকে হারাবার আশঙ্কায় তিনি আতঙ্কিত থাকবেন। একজনকে উপেক্ষা না করে আরেকজনকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়, যত্নআত্তির ফাঁকে ফাঁকে সেই দীক্ষা ছেলেমেয়েকে দেয়া মায়েদের দায়িত্ব ছিল।

তবে মজার ব্যাপার হলো, দিনশেষে সব মা তার ছেলেকে নাতি-নাতনিসহ একটি সুখী পরিবারের মাঝেই দেখতে চান। মোটাদাগে বলতে গেলে, প্রায় সব মা'ই ছেলের ভালো চান, ছেলের বউয়ের ভালো চান। তবে সকলের এই ভালো চাওয়ার পদ্ধতি এক রকম হয় না। প্রয়োজনে এই পদ্ধতির গঠনমূলক সংস্কার করার মানসিকতা থাকতে হবে। এই সংস্কারের ধারাবাহিকতায় শাশুড়ি-মা এভাবে চিন্তা করতে পারেন, বউ-মা ছেলের ভালোবাসায় ভাগ বসাতে আসে না; বরং ছেলের ভালোবাসার শূন্যতা পূরণ করতে আসে।

---

১৭. সূরা নূর, (২৪) : ৩২

৩. ছেলে-বউমার সব সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা

আমরা বাঙালিরা জাতিগতভাবে অন্যের ব্যাপারে বেশ উৎসাহী বা আগ্রহী বা কৌতূহলী। কেন যেন নিজের চেয়ে অন্যের প্রতি আগ্রহের পরিমাণটা আমাদের অনেক বেশি। আগে গ্রাম এলাকাগুলোতে বেড়ার ঘর ছিল বা উঠানে পাশের বাড়ির সীমানায় বাঁশের বেড়া দেয়া থাকত। বেড়ার ঘরের দেয়ালে বা দুই বাড়ির সীমানা দেয়ালে বিশেষ কায়দায় অপর মানুষদের দেখার কিছু গোপন ছিদ্র থাকত। পাশের বাড়ির মানুষজন কী করছে, কীভাবে উঠানে হাঁটাহাঁটি করছে, তা দেখার কেমন যেন এক প্রবল ইচ্ছা কাজ করত! বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের প্লট তৈরি হয়েছে এই কৌতূহল থেকে।

অন্যের হাঁড়ির খবর জানতে দারুণ লাগে! আর বেড়ার গোপন ছিদ্র দিয়ে কিছু দেখার পরে অন্যান্য মানুষদের কাছে তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করত। সবাইকে একইভাবে বলা হতো—আরে ভাবি শুনছেন... খবরদার কাউকে যেন বলবেন না... অমুক তো...।

এখন কাঁচা বেড়ার ঘরের জায়গায় উঠেছে পাকা দালান। বেড়ার গোপন ছিদ্রে 'একটা চোখগুলো' ডিজিটাল হয়েছে। কানাঘুষার জায়গা দখল করেছে চ্যাটবক্স, কমেন্ট সেকশন। অপরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রবল জানার আগ্রহের ধারাবাহিকতায় কিছু কিছু শাশুড়ি তাদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। বউ-মার কবে বাচ্চা পেটে আসবে সেটাও তাকে জানতে হবে! সবকিছু তার জানা চাই চাই। এত তাড়াতাড়ি কেন বাচ্চা হবে বা এত দেরিতে কেন বাচ্চা হবে? সবকিছুর মধ্যে তাদের অবশ্যই নাক গলাতে হবে।

এই ধরনের শাশুরিরা নাক গলানোর পেছনে কিছু যুক্তি খাড়া করে রেখেছেন। যেমন : 'আমার ছেলের বয়স আর কত-ই বা! ও কী বোঝে! ওর কি আর বিয়ের বয়স হয়েছে, ওর গায়ে ফুলের টোকাও লাগতে দিইনি! ও কীভাবে বুঝবে কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী করতে হবে না হবে!' ছেলের ক্ষেত্রে এসব মনে আসে ভালোবাসার মোড়কে আর বউ-মার ক্ষেত্রে এসব মনে আসে অবহেলার মোড়কে!

আর এই যে বউ-মা, তুমি কোথাকার কে! তোমার এত বড় সাহস আমার পরিবারের মধ্যে কথা বলতে আসো! তোমার ডিপার্টমেন্ট রান্নাঘর সেখানে যাও! মনে মনে শাশুড়ি বলতে থাকে, ওই মেয়ে সাংঘাতিক! আমার সংসার হাত

করতে এসেছে! কী চালাক! বয়সে ছেলের চেয়ে ছোট হলে কী হবে, খুব চালাক! খুব ধুরন্ধর! কোনো কিছু এদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। কী হতে কী হবে আল্লাহ মালুম!

যৌথ পরিবারেই না, একক পরিবারেও ছেলে-বউ এর সব খুঁটিনাটিতে কিছু কিছু শাশুড়ির নাক গলানোর প্রবণতা থাকে চরমে। কী কিনলে, কোথায় গেলে, কোথায় খেলে, এই লোশন কে দিল, কানের ওই দুল কে দিল, কবে দিল, কোথায় পেলে? বিছানার চাদর এভাবে বিছিয়েছ কেন? ঘরে খাট এভাবে রেখেছ? কেন তরকারিতে লবণ-ঝালের এই দশা? এমন হাজারো জবাবদিহি!

কিছু বাঁকা-ত্যাড়া, গোঁড়ামিপনায় ভরা বউ-মা ছাড়া গড়পড়তা অন্যান্য সব বউ-মাদের পছন্দ, সিদ্ধান্ত বা কাজগুলো কেন আলাদা হচ্ছে সেই কারণগুলো নিয়ে ওইসব শাশুড়িরা তেমন একটা ভাবতে চান না। ওই যে নাক গলানোর অভ্যাস! সন্তানকে সংসারী-স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার চেয়ে নিজেদের হুকুম তামিল করানোতেই উনাদের উৎসাহ বেশি! এই হুকুম চাপানোর সাথে সাথে সম্মান বা মর্যাদা পাওয়ার বিষয়গুলোকেও বউ-মার শাশুড়িটা কেমন যেন গুলিয়ে ফেলেন। এটা শাশুড়ি-মায়ের একটা ছোট্ট ভুল।

সম্মানিতা শাশুড়ি-মা!

আপনার মর্যাদা, সম্মান সঠিকভাবে হেফাজত করুন। সব জায়গায় কেন নিজেকে জড়াবেন? বউমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করা যায় কি? চোখের সামনে কল্পনা করা যায় কিনা—সময়, পরিবার, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, সংস্কৃতির পার্থক্য, জেনারেশন গ্যাপ সব একসাথে কীভাবে রুচিবোধ, পছন্দ, কাজকে আলাদা করে দিয়েছে? সম্পর্ককে নিরাপদ রেখে ছেলে-বউয়ের সিদ্ধান্তে বা কাজে কীভাবে মতামত দিতে হয় সে সম্পর্কে আরেকটু জানাশোনা বাড়ানো যায় কি না?

জানি, আপনি ছেলে ও বউ-মার ভালো চান। তাই সব ক্ষেত্রে বলতে থাকেন, এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। মানি, আপনি তাদের কোনো ক্ষতি চান না। তাই তাদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও স্পেস দেন না। যদি সমস্যা হয়, সব সিদ্ধান্তে মতামতকে চাপানোর চেষ্টা করেন।

তবে ভালো হতো না, আপনার ছেলে-বউ-মা আপনার জীবদ্দশাতেই আপনারই

চোখের সামনে ভুল করে ঠেকে, শিখে নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করত? মায়ের হয়তো ছেলের কষ্ট দেখতেও কষ্ট হবে, তারপরও সোনার খাদ দূর করতে হলে তাকে তো আগুনেই রাখতে হয়।

৪. ভুল সংশোধনের নিমিত্তে ভুল পদ্ধতি

- ছেলে বাইরে থেকে বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই—'জানিস, তোর বউ আজ কী করেছে!' ব্যস শুরু হয়ে গেল এক ঘণ্টার ... ।
- সামান্য ঘরটা ঝাড়ু দিতে পারে না, অপয়া একটা!
- তরকারিতে লবণ কম বা বেশি হলে—কী যে রাঁধে, মুখে তোলা যায় না! আর নিচে পুড়ে গেলে তো কথাই নেই! সব ধ্বংস করে ফেলবে, সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে!
- বাপ-মা কিছুই শেখায়নি নাকি? আনকালচার্ড!

এই ধরনের বাঁকা কথাগুলো শাশুড়িরা যে শুধু খোঁচা দেয়ার জন্যই বলেন তা না; বরং তারা চান তার জীবদ্দশাতেই বউ-মা যেন সংসারের সবকিছু ঠিকঠাক মতো বুঝে নিতে পারে। ভুলগুলো যেন শুধরে নিতে পারে। কারণ ভবিষ্যতে এই সংসারের হাল তো তাকে ধরতে হবে। বউ-মার যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য শাশুড়িরা তাকে নিখুঁত করার মিশনে নামেন।

নিঃসন্দেহে কোনো মানুষই নিখুঁত না, সবারই কিছু না কিছু ভুল হয়। আর অভিজ্ঞ চোখে আনাড়ির ভুল খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। নজর করে দেখলে আনাড়ি বউ-মার অনেকগুলো ভুল চোখে আসে। আচরণের ভুলভাল দিকগুলো চোখে আসার পর শুরু হয় ভুল সংশোধন পর্ব। ভুল দেখলে সেগুলোর সংশোধন তো ভালো কথা; কিন্তু এই সংশোধনের পদ্ধতিতে যদি সমস্যা থাকে তখন ভুল দূর করা খুব কঠিন হয়ে যায়।

ভুল সংশোধনের জন্য ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ বা পুত্রবধূর সমালোচনায় ইসলামি রীতিনীতি না জানা বা না মানা শাশুড়ি-মায়ের একটি ভুল। ভুলের বিষয়গুলো সরাসরি না বলে বাঁকা কথায় বলা, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলা, আগে বউ-মাকে না বলে ছেলের কানে বউ-মার বিরুদ্ধে কথা লাগানো, কথায় কথায় 'মা-বাবা

কিছুই শেখায়নি' বলা, ভুল সংশোধনের জন্য বউ-মাকে সময় না দিয়ে ভুল নিয়ে বেশি মাতামাতি করা, পরিবারের বাইরের মানুষজনের কাছে বউ-মার বদনাম করে বেড়ানো ইত্যাদি বউ-মার ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে শাশুড়ি-মায়ের একটি ভুল।

অনেকে শুধু অপদস্থ করার জন্যই ভুল ধরেন, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা বউ-মার সত্যিই ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরেন, তাদেরকে অবশ্যই সংশোধনের পদ্ধতির দিকে নজর দিতে হবে। পদ্ধতি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কার্যকরী, যেন বউ-মার শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতিটুকুও অটুট থাকে এবং সে সংসারের মারপ্যাঁচগুলোও দ্রুত শিখে নিতে পারে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

ঘরের ভেতর আরেকটি বিষয় দেখা যায়, ঘরে বউ আসার পরে ঘরের সবাই বউয়ের ভুল ধরতে উঠেপড়ে লেগে যায়। তাদের নিজেদের কী ভুল হচ্ছে সেদিকে খেয়ালটা খুব কম থাকে। নিজের ভুলগুলো না দেখে অন্যের ভুল ধরায় ব্যস্ত হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। শাশুড়ি হিসেবে শাশুড়ি-মায়ের কোনো ভুল হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে সচেতনতা কম দেখা যায়; বরং বউ-মা হিসেবে বউ এর কী কী ভুল হচ্ছে সেটা নিয়েই জটলা বেশি হয়। 'অপরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরা' দৃষ্টিভঙ্গি বউ-মার ভুল সংশোধনে এক বড়সড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বউ-মার ভুল সংশোধন করতে যাওয়াটা কোনো অন্যায় না; কিন্তু এই ভুল সংশোধন করতে যে সমস্ত অন্যায় পথ অনুসরণ করছি, সেগুলো অন্যায়।

তবে এক কাঠিতে ঢোল বাজে না। ভুল সংশোধনে শাশুড়ির সচেতনতার পাশাপাশি বউ-মারও সচেতনতা প্রয়োজন। ভুল সংশোধনের সঠিক পদ্ধতির প্রতি শাশুড়ির চেষ্টা-মেহনতের পাশাপাশি প্রয়োজন ভুল কাটিয়ে উঠতে বউ-মার দৃঢ় ইচ্ছা।

৫. বউ-মাকে মেয়ের মতো মনে করা

- তোমাকে মেয়ের মতো মনে করি, কিন্তু তোমার মধ্যে কখনো আমাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখি না!

- তোমাকে মেয়ের মতো মনে করি, তারপরেও তুমি এমনটা করতে পারো?

আমাদের সমাজে ভাবিকে মায়ের মতন, জামাইকে ছেলের মতো, শাশুড়িকে আপন মায়ের মতো বা বউ-মাকে মেয়ের মতো মনে করার একটা ধারা আছে। নিঃসন্দেহে এগুলো খুব শ্রুতিমধুর। হাতেগোনা কিছু পরিবার এ দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে। বাকিরা সুবিধা নিয়েছে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এ ধরনের বুলি আওড়ানোর পেছনে লুকিয়ে থাকে স্বার্থ হাসিল বা সুবিধা আদায়।

পরিবারের একেকজন সদস্যকে একেকভাবে সম্বোধন করা হয়। তাদের পদবি ভিন্ন, অধিকার আর দায়িত্বও ভিন্ন। মায়ের দায়িত্ব শাশুড়ি থেকে ভিন্ন, মেয়ের দায়িত্ব বউ-মার থেকে ভিন্ন। এটাই সংসারের সৌন্দর্য এবং দিনশেষে এটাই বাস্তব।

পরিবারের সকল সদস্যকে তার সম্মান এর যথাযথ জায়গায় রাখতে পারলেই পরিবারগুলোকে বেশি সুন্দর দেখায়। যার জন্য যে আচরণ প্রাপ্য তার সাথে সে আচরণই উত্তম।

এ ছাড়া আমাদের পথপ্রদর্শক সাহাবায়ে কেরামের নবী-প্রেমের বিভিন্ন নজির আছে। একবার উনারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সম্মানার্থে সিজদা করার অনুমতি চেয়ে ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেননি। সিজদা শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই।[১৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা হলো, যার যে মর্যাদা তাকে তা-ই দিতে হবে।

বউ-মাকে বউ-মা হিসেবে মর্যাদা দিলেই সেটা যথেষ্ট। আর একজন বউ-মার জন্য মেয়ে ভূমিকা পালন করার চেয়ে বউ-মা হিসেবে ভূমিকা পালন করা বেশি সহজ ও বাস্তবসম্মত। এতে বউ-মা নতুন সংসারে তুলনামূলক চাপমুক্ত থাকে আর শাশুড়ি-মায়েরও বউ-মার প্রতি লাগামহীন আশা তৈরি হয় না।

৬. তুলনা

- অমুকের বউ-মার কাজের ধারই আলাদা, দেখতে যেমন সুন্দর হাতের কাজও তেমন সুন্দর!

- একহাতে সংসার সামলানো, বাচ্চার দেখাশোনা আবার চাকরি! কী যে গুণী

১৮. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৪৪৭১। শায়খ শুআইব আরনাউতের মতে এই বর্ণনার সনদ দুর্বল। তবে সহীহ সনদে মুআজ ইবনু জাবাল রাযি.-এর ব্যাপারে এককভাবে সমার্থক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৮৫২। সহীহ লিগায়রিহি।

মেয়ে! সচরাচর দেখা যায় না। কপাল! কপাল! তা না হলে এমন বউ পায়! অমুক আপার কপালের জোর আছে।

- আর অমুকের বউটা যে কী লক্ষ্মী! এত ব্যস্ততা তারপরও সবার দিকে কত খেয়াল! বাচ্চাদের যত্নে যেমন চৌকোনা তেমনি স্বামীর যত্ন। আসলেই ঘরের লক্ষ্মী।

- আমার মেয়েই কি সংসারের জন্য কম করে? কী করে না শ্বশুরবাড়ির মানুষের মন জোগাতে! আর আমার বেটার বউ!

- আমিও একসময় বাড়ির বউ ছিলাম! সারাদিন এত এত কাজ করতাম! আমার মতো এত কাজ তো তোমাদের করা লাগে না।

ওপরের উদাহরণগুলোতে পুত্রবধূর গুণের সাথে অন্যের তুলনা করা হচ্ছে। অনেক শাশুড়ি আছেন যারা কথায় কথায় তুলনা করেন। অনেকে বোঝে, বউকে উপদেশ দেয়া মানেই তুলনা করা। যাতে তার বউ-মাও অমুকের অমুক গুণ নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। এ কারণে তুলনা করে শেখান। এই কৌশল কেমন কাজ করে উনারাই জানেন!

আবার অনেকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা থেকেও তুলনা করেন। পুত্রবধূকে চাপের মধ্যে রাখার একটা সহজ উপায় হলো, তাকে অন্যের সাথে তুলনা করে হেয়-প্রতিপন্ন করা। এভাবে শেখালে বউ-মা কতটুকু শেখে সেটা বলা মুশকিল, তবে এটা নিশ্চিত যে সে অপমানিত বোধ করে।

এসব শুনতে শুনতে বউ-মার মনে হয়, অন্যের বউ-মা এত ভালো, এত গুণী, এত সুন্দরী, এত পরিশ্রমী—সব ভালো গুণ তাদেরই আছে, আর আমার কিছুই ভালো না। অন্যের ভালো দিক খুব চোখে পড়ে, কিন্তু আমার ভালো কোনো দিক কখনোই চোখে পড়ে না। বউ-মার মনে ক্ষোভ জমে, শাশুড়ির প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ে।

উৎসাহ দিলে বা প্রশংসা করলে যে কাজটা হয়, তুলনা করলে এর ঠিক বিপরীত কাজটা হয়। ছেলের বউয়ের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য নতুন করে দেখতে চান, সেগুলো সরাসরি তাকে বলুন। হয়তো বলবেন, সরাসরি বলে তেমন একটা কাজ হয় না!

সরাসরি বলে যদি কাজ না হয়, তবে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে বা খোঁচা মেরে বললেও

কাজ হবে না। তাই বাইরের কারও সাথে অসামঞ্জস্য তুলনা করে শাশুড়ির মায়ের নিজের ব্যক্তিত্বকে ছোট করার কোনো মানে হয় না।

আর তা ছাড়া আজ যাকে দেখে তুলনা করছি, কাল তার বড় কোনো খারাপ দিক আলোচনায় আসবে না—তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

৭. বউ-মাকে দায়িত্ব শেখাতে অতি ব্যস্ততা

- বাড়ির বউ হয়েও এটা করবে না? এত পড়াশোনা করেছ আর এগুলো শেখোনি?

- তুমি ঘরের বউ, তুমি থাকতে এ কাজ কেন আমার মেয়ে করবে?

- তুমি বাড়ির বউ হয়েও এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাও! দায়িত্ব জ্ঞান নেই? দায়িত্ব জ্ঞান তো দূরের কথা, চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নেই।

- শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েছ আর জানো না কীভাবে সব সামলাতে হয়! বাপ-মা কিছুই শেখায়নি?

বিয়ের পরদিন থেকেই শুরু হয় দায়িত্ব শেখানোর জন্য উঠেপড়ে লাগা। সব শাশুড়ি বা সব শ্বশুরবাড়ি এমন না। কিছু কিছু শাশুড়ি বা শ্বশুরবাড়ির মানুষ মনে করেন, দায়িত্ব শেখানোর জন্য নতুন কালটাই একমাত্র সময়, পরে বউ-মার চোখ-কান খুলে যাবে, তখন আর কিছু শেখানো-বোঝানো যাবে না।

আবার কিছু কিছু শাশুড়ি থাকেন ভীষণ এগোসেন্ট্রিক। উনারা তাদের ইগো থেকে মনে করেন, সবাই তার প্রাপ্য ফুলফিল করবে, কিন্তু সে কারও ব্যাপারে দায়িত্ব নেবে না। এ ধরনের শাশুড়ি-মায়েরা নিজেদের অনেক বড় মনে করেন, আত্মতৃপ্তি অনেক বেশি, নিজেদের প্রতি ধারণা অনেক উঁচু, বোধশক্তি ও জ্ঞানে অনন্য। উনাদের সেলফ রেস্পন্সিবিলিটি থাকেই না বলতে গেলে। এই ধরনের শাশুড়ি-মায়েরাও বউ-মাকে দায়িত্ব শেখাতে বড় তাড়াহুড়া করেন, ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আবার অনেকে আছেন, চমৎকার উপায়ে বউ-মাকে নিজের মতো করে গড়ে নেন।

আর সত্যি বলতে কী, নতুন বউয়ের শেখার অনেক কিছু থাকে, অনেক কিছু।

নতুন সংসার, নতুন পরিবার, নতুন মানুষজন, এ সবকিছুই নতুন মেয়েটার কাছে নতুন। এই নতুনের সাথে তাকে পরিচিত হতে হয়, ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। নতুন পরিবেশের সাথে নতুন বউকে সম্পৃক্ত করতে শাশুড়ি-মায়ের অনেক বড় একটা ভূমিকা থাকে। বউ-মাকে দায়িত্ব-কর্তব্য শেখানো, কখন কীভাবে কী করতে হবে, সংসার কীভাবে সামলে নিতে হবে—এসব শেখানোর জন্য স্বামীর পরে শাশুড়ি-মা'ই সবচেয়ে নিরাপদ।

কথায় আছে না, 'A daughter in law cannot be perfect by herself, a beautiful mother in law helps her to be one.'

এখন প্রশ্ন হলো, শ্বশুরবাড়িতে বউ হিসেবে যথাযথ রোল প্লে করতে শাশুড়ি-মা কীভাবে বউ-মাকে সাহায্য করতে পারে? অথবা বউ-মার দায়িত্বশীলতা বাড়াতে শাশুড়ি-মা কী করতে পারে? অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শাশুড়ি-মায়ের অবদান কেমন হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে কিছু জানাশোনা বা মাথা খাটানোর অবকাশ কিন্তু শাশুড়ি-মায়ের আছে। জেনারেশন গ্যাপকে মাথায় রেখে সেকেলে গতানুগতিক উপায় ছাড়াও আরও কিছু উপায় বা পদ্ধতির প্র্যাকটিস করা যায় কি না?

সাধারণত আমাদের চাওয়া একটা আকাঙ্ক্ষা আর পাওয়া একটা প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি বিষয় থাকে। যেমন ধরুন, আমি চাই আমার বউ-মার মধ্যে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাক। তাহলে এই চাওয়াকে সামনে রেখে আমার উদ্দেশ্য, তারগীব (উৎসাহ) দেয়ার পদ্ধতি এবং শব্দ চয়ন হিকমার সাথে হতে হবে। উদ্দেশ্য, তারগীব দেয়ার পদ্ধতি এবং তারগীব দেয়ার নিমিত্তে শব্দ বাছাই যদি হিকমাতপূর্ণ হয়, তবে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আবার শাশুড়ি-মা উনার চেষ্টা দিয়েই যে বউ-মাকে শতভাগ সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারেন, এমনটি সব সময় হয় না। নিঃসন্দেহে বউ-মার আন্তরিক চেষ্টাও কাম্য। গর্ত থেকে আপনি তাকে সহজে তুলতে পারবেন, যে হাত উঁচু করে আছে।

সঠিকভাবে শেখা বউ-মার দায়িত্ব, কিন্তু সঠিক সুন্দরভাবে শেখানো শাশুড়ি-মার দায়িত্ব। দায়িত্বে সে ভুল করলে বা ত্রুটি করলে সে ভুগবে, আর দুনিয়াতে যদি ভুগতে নাও হয়, তারপরও কাল হাশরের মাঠে মালিকের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আপনি যদি এ সম্পর্কিত আপনার দায়িত্বটুকু সুন্দর করে পালন

করেন, নিঃসন্দেহে দিনশেষে এটুকু আপনাকে তৃপ্তি দেবে। আপনার এই ভালো পদক্ষেপ সমাজে 'ভালো' ছড়াবে। সমাজকে একটু হলেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৮. মুখের ওপর সত্যি কথা বলি তো, তাই আমি খারাপ

- আড়ালে কোনো কথা বলি না, এই অভ্যাস আমার নেই, যা বলি সামনাসামনি বলি।

- সত্য কথা বলতে কারও পরোয়া করি না।

- সত্য কথা... ভয় কিসের? সত্য বললে কেউ যদি অপমানিত হয়, হবে। কারও গায়ে লাগলে লাগবে। আমার কী যায় আসে, সত্য তো সত্যই!

এসব কথাবার্তা বলেই খারাপ ব্যবহারগুলো শুরু হয়। খারাপ ব্যবহারগুলো বৈধ করার চেষ্টা করা হয়। যেমন ধরুন, বউ-মা কোনো ভুল করল বা অন্যায় কোনো কাজ করল। আপনি সাথে সাথে React (প্রতিক্রিয়া প্রকাশ) করলেন, বকাঝকা করলেন। বউ-মা সত্যিই অন্যায় করেছে এবং আপনি সত্যি বিষয়টি নিয়ে বকা দিলেন। কেউ যখন কোনো ভুল বা অন্যায় করে তখন তার মন কিছুটা দুর্বল থাকে এবং নিজের ভুলের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজতে থাকে। এ সময় সামনাসামনি সত্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলেও তার আত্মসম্মানে লাগে। মনে মনে আপনার ভুল বা খারাপ দিকগুলো আওড়াতে থাকে। আর আমরা তো মানুষ, ছোট-বড় সবারই কিছু না কিছু দুর্বল দিক থাকে। ইচ্ছে করলেই কাছের মানুষদের খারাপ দিকগুলো খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায়।

আপনি যত তার বিরুদ্ধে বলতে থাকেন, সে তত তার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজতে থাকে। সাধারণত এরকম স্পষ্টভাষী শাশুড়ির বকাঝকা থেকে বউ-মা সংশোধন হবার চেয়ে বিগড়ায় বেশি। উপরন্তু শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব তৈরি হয়। বউ-মা হয়তো এক ভুল বারবার করে ফেলছে, সেও হয়তো চাচ্ছে এটা থেকে বের হয়ে আসতে। বউ-মার মধ্যে যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে সঠিক পদ্ধতির উপদেশ তার জন্য যথেষ্ট। আর সে যদি খুবই বদ্ধ মনের হয়, তবে তাকে বোঝানো খুবই কষ্টকর।

এখন কথা হলো, একজন মানুষ একটা খারাপ আচরণ করছে, তার সংশোধন

নিমিত্তে আমার জন্যও খারাপ আচরণ বৈধ হয়ে যায় কি না? সত্য কথা মুখের ওপর কড়া ভাষায় বলে দেয়াকে ইসলাম কতটা সমর্থন করে, আপনি আপনার নির্ভরযোগ্য কারও কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। তিক্ত সত্যকে মেনে নেয়ার মতো ক্ষমতা সবার সব সময় থাকে না; মাঝে মাঝে তিক্ত সত্য অনেকের শেষ মনোবলটুকুও ভেঙে দেয়। মুমিনদের জন্য সুন্নাতসম্মত পদ্ধতির অনুসরণই একান্ত কাম্য।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি.-কে তাহাজ্জুদের তাগীদ দিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে বলেছিলেন—আবদুল্লাহ কতই-না ভালো লোক, (আরও ভালো হতো) যদি সে রাতের নামাজ বা তাহাজ্জুদ আদায় করত![১৯]

এ নিয়ে বিস্তারিত 'সমালোচনা' অধ্যায়ে লেখা আছে।

৯. একাধিক পুত্রবধূকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা

শাশুড়ি-মায়ের যদি একাধিক পুত্রবধূ থাকে, তবে খুব কমসংখ্যক শাশুড়ি আছেন, যারা বউ-মাদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে পারেন। সহজ কথায়, সব বউ-মার জন্য একই রকম আদর বা শাসনের মানদণ্ড সামনে রাখতে পারেন হাতেগোনা কয়েকজন শাশুড়ি। কোনো-না-কোনো দিকে গাড়ি হেলে যায়। দেয়া-নেয়া, আদর-মহব্বত, শাসন, তরবিয়তে একেক বউ-মার জন্য একেক রকম স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা শাশুড়ি-মায়ের একটা বড় ভুল।

আপনি আশেপাশে এমন অনেক শাশুড়ি-মা দেখতে পাবেন যারা দাদি-নানি হয়ে গেছেন, কিন্তু সব নাতি-নাতনির মাকে এক চোখে দেখেন না। আপনি হয়তো বলবেন, সবার আচরণ তো এক রকম হয় না, কোনো বউ-মার আচরণ বেশি আন্তরিক, কোনো বউ-মার আচরণে আন্তরিকতা কম; কেউ বেশি প্রকাশ করতে পারে, আবার কারও প্রকাশ ক্ষমতা কম। ঠিক, যে বেশি আন্তরিক তার প্রতি মনটা ঝুঁকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই বলে যে আন্তরিক আচরণ করতে পারছে না, তাকে সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারায় কোনোভাবে বঞ্চিত করা কতটুকু যুক্তিসংগত?

অনেক পরিবারে এমন দেখা যায়, দুজন বউয়ের মধ্যে একজন তার শাশুড়ির

১৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২২

কোনো খেদমত করছে না, তারপরও এতে শাশুড়ির মন খারাপ হচ্ছে না; বরং মনে মনে ভাবছে, ওর তো ওই সমস্যা, ও কীভাবে এটা করবে? আরেকজন অনেক কিছু করলেও তার কাজের মধ্যে ভুল ধরতে শাশুড়ি অস্থির। একজনের জন্য একধরনের প্রত্যাশা, আরেকজনের জন্য আরেক রকমের প্রত্যাশা—ব্যাপারটা কেমন না?

আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখা যায়, পরিবারের মধ্যে কোনো এক ছেলে দিনরাত খেটে, পরিশ্রম করে বেশি টাকাপয়সা ইনকাম করে। আর একজন ছেলে অলসতা বা অযোগ্যতা বা যেকোনো কারণে কম টাকা-পয়সা ইনকাম করে। বউ-মা বা ছেলের দিনরাত পরিশ্রম এর দিকে না তাকিয়ে আরেক বউ-মা বা ছেলের দৈন্য অবস্থার প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল হওয়া, দুজনের অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকম করার জন্য তুলনামূলক দুর্বলজনকে কিছুটা বেশি সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ দেয়াটা কেমন?

একেক বউ-মার প্রতি আন্তরিকতা একেক রকম হলেও তাদের প্রতি প্রত্যাশা বা তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা শাশুড়ি-মায়ের একটি সমস্যা। এ ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ভীষণ জরুরি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করে নির্দেশনা দিয়েছেন,

اِتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করো।'[২০]

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে—যদিও তা স্বজনদের সম্পর্কে হয়। আর আল্লাহ-প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[২১]

---

২০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৩

২১. সূরা আনআম, (৬) : ১৫২

সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয়

সংসার ভাঙন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক যে কী পরিমাণ হুমকির মুখে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের ঘরে ঘরে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। Steven Stosny তার বই 'You don't have to take it anymore'- এ বউ-শাশুড়ির সম্পর্কের অবনতিকে মহামারির সাথে তুলনা করেছেন।

এই মহামারি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছোট-বড় কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এই অংশে সে রকম কিছু করণীয় কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলোকে একত্র করে আমাদের দেশের মানুষের চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রথম অংশে শাশুড়ি ও বউ-মা

উভয়ের নিজেদের যত্নের প্রতি তাগীদ দেয়া হয়েছে।

তারপর দ্বিতীয় অংশে শাশুড়ি-মা ও বউ-মার পৃথকভাবে কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেন তারা কিছুটা হলেও নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। ওয়া মা তাওফীকুনা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের কারোরই কোনো কিছু করার সাধ্য নেই)।

বউ-মা ও শাশুড়ি-মায়ের উভয়ের প্রতি নিবেদন

সাইকোলজিস্টদের মতে আমাদের অধিকাংশ সমস্যার কারণ আমরা নিজেরাই! অন্যের না, নিজেদের কারণেই আমরা বেশি সমস্যায় পড়ি। আবার ইসলামে নিজের নফস ও শয়তানকেই সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার শেখানো একটি দুআ হচ্ছে দুআ ইউনুস।[২২] সেখানেও নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বৃদ্ধ গৃহকর্তার একটা মজার গল্প আছে।

এক গ্রামে এক সুখী দম্পতি ছিলেন। উনারা কয়েক দশক ধরে একসাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলেন। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বৃদ্ধ গৃহকর্তা অনুধাবন করছেন যে, তার গৃহকর্তী কিছুই তেমন একটা শুনতে পারছেন না। তিনি চিন্তা করলেন, বয়স হয়েছে কানের ডাক্তার দেখানো দরকার; আমার বউয়ের যে কী হলো, কিছুই শুনতে পারছে না!

বৃদ্ধ ডাক্তারের সাথে কথা বললেন। ডাক্তার বৃদ্ধকে বললেন, আপনি প্রাথমিকভাবে একবার পরীক্ষা করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন, তারপর আমি চেকআপ করব। ডাক্তার এও বলে দিলেন যে, আপনি ৪০ ফুট দূর থেকে আপনার স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোর গলায় কথা বলবেন; তিনি শুনতে পারছেন কি না খেয়াল করবেন। ৪০ ফুট দূরত্বে যদি শুনতে না পান,

---

২২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদাপদে বেশি বেশি দুআ ইউনুস পাঠ করার আদেশ করেছেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

'(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, আপনি পবিত্র-মহান, নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' -সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫০৫। সহীহ।

তবে ৩০ ফুট দূরত্ব থেকে বলবেন; ৩০ ফুট দূরত্ব থেকে যদি শুনতে না পান, তবে ২০ ফুট দূরত্ব থেকে কথা বলবেন। এভাবে দূরত্ব কমাতে হবে। কত দূরত্বে সে আপনাকে শুনতে পেল তা আমাকে জানাবেন।

গৃহকর্তা বাসায় এসে দেখলেন, তার স্ত্রী রান্না করছে রান্নাঘরে।

৪০ ফিট দূরত্ব থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, আজ রাতের খাবারে কী আছে?

কোনো জবাব নেই। গৃহকর্তা ডাক্তারের কথামতো দূরত্ব কমাতে লাগলেন।

গৃহকর্তা পেরেশান। হায় আল্লাহ, আমার বউয়ের কানে কী হলো!

বৃদ্ধ তার গৃহকত্রীর একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ রাতের খাবারে কী আছে?

কত্রী চিৎকার করে জবাব দিলেন, 'মুরগির গোশত'। এই নিয়ে ছয়বার হলো বলা যে, আজ রাতের খাবারে মুরগির গোশত আছে!

কার সমস্যা তাহলে? কে কানে কম শোনে?

আমরা অধিকাংশ ওই বৃদ্ধ গৃহকর্তার মতোই—অন্যের সমস্যাটা জানি, কিন্তু নিজেরটা জানি না। এমনকি আমরা আমাদের আশপাশের মানুষ, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, দেশ সম্পর্কে জানতে এত ব্যস্ত যে, শেষমেশ নিজেকে জানার আর সময় পাওয়া যায় না। না পাওয়া যায় নিজেকে সময় দেয়ার সময়, না পাওয়া যায় নিজেকে নিয়ে ভাবার সময়। তাই চারপাশ সম্পর্কে অনেক জানলেও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান সেই ভাসাভাসাই থেকে যায়।

কে জানে, হয়তো আমার নিজের কোনো সমস্যাই আমার জন্য ফাঁদ।

হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, আচরণগত সমস্যা, চিন্তার প্রক্রিয়ায় বা সমাধানের পদ্ধতিতে সমস্যা বা অন্য কোনো সমস্যাই আমার ভোগান্তির কারণ।

১. নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা

আমাদের সবারই নিজের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রফেসর মেগ সেলিগের (Professor Meg Selig) মতে নিজেকে চেনার মাধ্যমে কিছু

উপকার হয়। যার সারকথা নিচে দেয়া হলো :

- অসম্ভব সুখী ও সফল একজন মানুষ হওয়া থেকে যে জিনিসটা আমাদের সবচেয়ে বেশি বাধা দেয় তা হলো—আত্মসন্দেহ, দোটানা-দোমনা ভাব। হবে তো? পারব তো? তখন আপনি নিজেই হয়ে যান নিজের শত্রু, সমালোচক! যখন আপনি আপনার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখবেন তখন আত্মসন্দেহ আপনাকে খাঁচায় ভরতে পারবে না।

- সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে যে অভাবনীয় 'সম্ভাবনা' দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা সে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এবং এই বিশ্বাস তাকে এতটা দামি করে যে, এমনকি টাকাও তা কিনতে পারে না। এই বিশ্বাসটা তাকে বাস্তবেও সমাজের মূল্যবান একটি সম্পদে পরিণত করে।

- মাঝে মাঝে আমরা কঠিন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হই। বিবেক বলে এক, মন বলে আরেক। এসব পরিস্থিতিতে সত্য বা করণীয়কে আলিঙ্গন করা এবং বর্জনীয়কে ত্যাগ করা নিজেদের জন্য সহজ হয়।

- অনেক সময় আমাদের আবেগ-অনুভূতি, ভালো থাকা, খারাপ থাকা সব নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে চলে। সে আমাকে এটা বলল, শুনে খুশি হলাম এবং ভালো থাকলাম। আরেকজন আমাকে ওটা বলল, শুনে কষ্ট পেলাম এবং খারাপ থাকলাম। পুতুলনাচের মতো লোকে যেভাবে নাচাচ্ছে নাচছি। নিজেকে চিনলে এই সুতা আপনার নিজের হাতে থাকবে।

- অতীতের শত শত ট্রমা, ব্যর্থতা, ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধবোধ নিঃশর্তভাবে নিজেকে ভালোবাসতে দেয় না। নিজের মুখোমুখি হলে নিজেকে ভালোবাসার সংগ্রাম করতে হয়। নিজেকে চিনলে এই সংগ্রাম কিছুটা হলেও সহজ হবে। পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ আরেকটু ব্যাপকভাবে আত্মানুরাগ (Self Love) সম্পর্কে বলা হবে। সত্যি বলতে কি, এই বিষয়টিই আপনাকে এক 'অসাধারণ আপনি'তে পরিণত করবে।

- আমরা একেকজন একেক রকম—কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ সুন্দর না; কেউ লম্বা, কেউ খাটো; কেউ ধনী, কেউ গরিব। আমাদের একেকজনের সামাজিক অবস্থান, সম্মান, খ্যাতি, সচ্ছলতা, দুর্বলতা, সবলতা একেক রকম। আমাদের বাহ্যিক অবস্থা যার যেমনই হোক না কেন, সেটাকে মেনে নিয়ে শোকরগুজার হওয়া সহজ হয়।

- যখন আপনি নিজেকে চিনবেন, নিজের সীমাবদ্ধতাকে জানবেন তখন অন্যের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতাও সহজে চিনতে পারবেন। তখন আত্মীয়-স্বজন বা কাছের মানুষদের সাথে আপস করে চলতে সহমর্মিতা ও সহানুভূতির অনুশীলন খুব অসাধ্য মনে হবে না। এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। নিজেকে জানাও হবে, অন্যকে চেনাও হবে।

- 'পাছে লোকে কী বলে' এই ভয়েই তো আমরা পাখা মেলি না, তাই না? নিজেকে চেনার মিশন এসব আজেবাজে চিন্তা থেকে আপনাকে টেনে বের করে আনবে। ভুল হবে ভেবে চেষ্টা না করা—এই নীতিতে আর পড়তে হবে না। ভুলের ভয় কেটে যাবে।

এখানে আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন থাকল। খাতা-কলম নিয়ে বসুন এবং উত্তর লিখুন। (প্রশ্নগুলোর ধারণা, The 7 Habits of Highly Effective Teens বই থেকে নেয়া হয়েছে)

১. যারা আপনার জীবনে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে তাদের নাম লিখুন। তাদের কোন কোন ভালো দিকগুলো আপনি আপনার নিজের মধ্যে আনতে চান লিখুন।

২. আজ থেকে ২০ বছর পরের একটি দিনের কথা মনে করুন। আপনি কোনো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সেখানে আপনার সব কাছের মানুষেরা থাকবে, থাকবে আপনার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সেইসব গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা। উনারা কারা?

৩. মনে করেন, ২০ তলা ভবনের ছাদের ওপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে আরেকটি ২০ তলা বিল্ডিং আছে। এই দুই ভবনের মাঝখানে পাঁচ ফুট দূরত্ব আছে। আপনাকে বলা হলো, লাফ দিয়ে এই ছাদ থেকে ওই ছাদে যেতে হবে। এতে আপনি মারাও যেতে পারেন। আপনি বললেন, আমি পার হব যদি আমাকে 'ওই জিনিসটা' দাও। জিনিসটা কী? কিসের বিনিময়ে আপনি নিজেকেও কম্প্রোমাইজ করতে পারেন?

৪. এমন একটি লাইব্রেরির কথা মনে করুন, যেখানে সব ধরনের বই আছে। ওই লাইব্রেরিতে কাটানোর জন্য আপনাকে এক দিন সময় দেয়া হলো। আপনি কোন বই পড়বেন বা কোন বিষয়ের ওপরে লেখা বই পড়বেন?

৫. এমন দশটি বিষয়ে লিস্ট করুন, যেগুলো করতে আপনি সত্যিই খুব ভালোবাসেন।

৬. জীবনে কখন আপনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

৭. মনে করুন, এখন থেকে পাঁচ বছর পরে কোনো একটা লোকাল পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হবে। পত্রিকার রিপোর্টার বাবা-মা-ভাই-বোন ও স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে একটি ইন্টারভিউ নেবে। আপনি তাদের (বাবা-মা-ভাই-বোন, স্বামী/স্ত্রীর) কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে কী ধরনের মন্তব্য শুনতে চান?

৮. এমন কোনো একটা প্রতীকের কথা চিন্তা করুন, আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করে; যেটা দেখলে আপনার কথা মনে হবে। অনেকটা আপনার ব্র্যান্ডিংয়ের মতো। হতে পারে কোনো পাখি, গাছ, ফুল বা পাতার ছবি।

৯. সবারই কিছু না কিছু গুণ থাকে, আপনার মধ্যে কী কী গুণ আছে?

১০. আপনার মধ্যে কি কোনো দোষ আছে? থাকলে সেগুলো কী কী?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার পর আপনি এখন নিজের সম্পর্কে আগের থেকে কিছুটা হলেও বেশি জানেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি (বউ বা শাশুড়ি) নিজের যত্ন নিতে কী কী করতে পারেন?

নিজের যত্ন, নিজেকে নিয়ে চিন্তা, নিজের সংশোধন, নিজের জন্য দুআ করা ইসলামের অন্যতম একটি শিক্ষা।

পবিত্র কুরআনের সূরা শামস-এ আল্লাহ তাআলা সাত জিনিসের শপথ নিয়ে বলেছেন, 'সে-ই সফলকাম হবে যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰهَا ﴿۱﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ﴿۲﴾ وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ﴿۳﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ﴿۴﴾ وَ السَّمَآءِ وَ مَا بَنٰىهَا ﴿۵﴾ وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰىهَا ﴿۶﴾ وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ﴿۷﴾ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ

تَقْوٰىهَا ﴿٨﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ﴿٩﴾ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ﴿١٠﴾

'শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়; শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে; শপথ রাতের, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে; শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর; শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর; শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে। আর সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।'[২৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত—কারও জন্য দুআ করলে প্রথমে নিজের জন্য দুআ করা।

আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআ করতেন তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।'[২৪]

বিভিন্ন সাইকোলজিস্ট ও সাইকোলজিকাল অরগানাইজেশন নিজেকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পাঁচটি বিষয় নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। সেগুলো হলো :

১. (ক) নিজের প্রতি ভালোবাসা বা আত্মানুরাগ (Self- Love)

১. (খ) নিজস্ব দায়িত্ববোধ (Self-Responsibiity)

১. (গ) দায়বদ্ধতা (Self-Accountibility)

১. (ঘ) সংশ্লিষ্টতা (Self-Attachment)

১. (ঙ) আত্মনিয়ন্ত্রণ (Seft-Control)

১. (ক) নিজের প্রতি ভালোবাসা বা আত্মানুরাগ (Self-Love)

যখন আশপাশ, কাছের মানুষজন, দুর্ভাগ্য কোনোটাকেই বদলাতে পারছি না তখন যে জিনিসটি তাৎক্ষণিক আঁকড়ে ধরা দরকার তা হলো 'আত্মানুরাগ'। আপনি যদি আত্মানুরাগ বাড়াতে চান, তবে আপনাকে শারীরিক ও মানসিক

২৩. সূরা শামস, (৯১) : ১-১০

২৪. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২১১২৬; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৯৮৪। সহীহ।

যত্নের পথ ধরেই এগোতে হবে। শরীরের যত্ন বলতে পরিমিত খাওয়া, পরিমিত ঘুম ও নিয়মিত শরীরচর্চা। আর মানসিক যত্ন বলতে চিন্তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কিছু সংযোজন-বিয়োজন। এই দুই ধরনের যত্ন আমাদের নিজেদের প্রতি ভালোবাসাকে বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণসহ কিছু আলোচনা করা যাক :

৪. অমুক আপা ছেলে-বউমা নিয়ে কত সুখে আছে আর আমি? অন্যের সাথে তুলনা করে নিজের মান বিচার করা আমাদের একটা প্রকৃতি। তুলনা করে কখনো হতাশ হই, কখনো অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করি। কিন্তু এই পৃথিবীতে একজন মানুষও নেই, যে ঠিক আপনার মতো। আপনার তুলনা কেবল আপনিই হতে পারেন। তুলনা যদি করতেই হয়, আপনার আজকের সাথে আপনার গতকালের বা আপনার আগামীকালের তুলনা করতে পারেন। আজ একটা ভালো কাজ করেছি, আগামীকাল দুইটা ভালো কাজ করব। অন্যের সাথে তুলনা করতে যে শক্তি খরচ হয়, সেটুকু বরং আপনার নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যয় করুন। এতে নিজের প্রতি ভালোবাসা বাড়বে।

৫. রান্না করার সময় কেউ যদি মনে করে, আমি রান্নায় তেমন অভিজ্ঞ না, রান্না করলে স্বাদ কেমন হবে না-হবে সেই ভয়ে 'থাক রান্না করব না, নতুন কোনো রেসিপি করব না, ভুল করা যাবে না, সব সময় পারফেক্ট হতেই হবে' ওভার পারফেকশনের এই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে 'ভুল করব, ভুল থেকে শিখব, এক ভুল বারবার করব না' এই চিন্তা মাথায় ঢোকানো ভালো। আপনার চিন্তার ধারাকে এই ছাঁচে ঢালা যায় কি না? হাদীস থেকে আমরা জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

> 'আদম সন্তানের প্রত্যেকেই ভুলকারী। আর তাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তওবাকারী।'[২৫]

ভুল আমাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। ভুলের ভয়ে উদ্যোগ নেয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

৬. কেউ যখন তার পোশাকের চাকচিক্য, বাহ্যিক সাজসজ্জা ও শারীরিক

২৫. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯৯। হাসান।

সৌন্দর্যকে প্রভাব তৈরির বা মূল্যায়ন পাওয়ার একমাত্র মানদণ্ড মনে করে, তখন তার জন্য কথা-কাজকে সুন্দর করা একটি গৌণ বিষয় হয়ে যায়। তার কস্টিউম, ফিগার, চেহারা যদি আকর্ষণীয় না হয়, তবে নিজেকে ভালোবাসা তার জন্য কঠিন। আর এগুলোই যদি মূল্যায়নের মানদণ্ড হতো, তবে কবরে যাওয়ার পর এভাবে পচে-গলে যেত না! তাই ইসলাম আমাদের বারবার সতর্ক করেছে বাহ্যিক সৌন্দর্যের পেছনে না পড়ে ভেতরের সৌন্দর্য অর্জনে সচেষ্ট হতে। ভেতরে সৌন্দর্য আত্মানুরাগ বাড়ায়। হাদীসে এসেছে,

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তারাই, যাদের আচার-আচরণ ভালো।'[২৬]

৭. একটা বাচ্চা হয়ে গেলেই মায়েদের আর নিজের শরীরের যত্নের কথা মনে থাকে না। সারাক্ষণ ছেলেমেয়ে, স্বামী, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, রান্না, সংসার ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ততা যে, এক কাপ কফিও আয়েশ করে বসে খাওয়া হয় না। দেখা গেল, মা তার বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে হাতে মেহেদি দিতে বসেছে, হঠাৎ বাচ্চা উঠে পড়ল, সাথে সাথে হাত ধুয়ে ছটফট করে বাচ্চার কাছে ছুটে গেল মা। এত তাড়াহুড়ার দরকার কী? বাচ্চা দু-এক মিনিট কাঁদলে এসপার-ওসপার হয়ে যাবে না! হাতে মেহেদি দিয়েও বাচ্চা সামলানো যাবে। বাচ্চা আছে বলে নিজের কোনো শখ পুরা করা যাবে না, এটা কেমন কথা, সাজগোজ তো দূরের কথা! অনেকে তো আছে রান্নার পর বড় বড় মাছ-গোশতের টুকরাগুলো অন্যের জন্য রেখে দিয়ে নিজের জন্য রাখে কিছু ছোট টুকরা, সাথে ঝোল একটু বেশি। সন্তান, স্বামী-সংসারের এত যত্ন করে যে, নিজের খাওয়া-ঘুম এর কী হলো সেদিকে কোনো খেয়ালই থাকে না।

এভাবে আপনি কতদিন বাঁচবেন? আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে আপনার সংসার, স্বামী, সন্তানের যত্ন কে করবে? পরিবারকে ভালো রাখতে হলে আগে আপনাকে ভালো থাকতে হবে। আয়েশ করে বসে এক কাপ কফি খেতে হবে। বাগানের শখ থাকলে বাগান করতে হবে, বই পড়ে আনন্দ পেলে পড়তে হবে। মোটকথা, আপনার আনন্দের উপকরণ আপনাকেই ম্যানেজ করতে হবে।

---

২৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩৫

৮. সংসারে মাঝে মাঝে এমন অনেক পরিস্থিতি আসে যখন ভীষণ মন খারাপ হয় বা ভীষণ আনন্দ হয়। দুঃখ বা সুখ যে ধরনের আবেগ-অনুভূতিই আপনার মনে আসুক না কেন, তা প্রকাশ করতে কোনো লজ্জা করা যাবে না। কান্না আটকে রাখা বা হাসি চেপে রাখা খুব একটা ভালো বৈশিষ্ট্য না। কান্না পাচ্ছে, হাউমাউ করে কাঁদুন। সংকোচ কিসের? সবকিছুতে বেড়া দিতে যাবেন না। তবে যেকোনো আচরণে ভারসাম্যের কথাটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

৯. হাদীসে আছে, মানুষের যদি দুইটি ধনভান্ডার থাকে তবুও সে তৃতীয়টির জন্য লালায়িত হবে।[২৭] আমাদের চাওয়া আর পাওয়ার প্রতিযোগিতা লাগামহীন। যত পাই তত চাই। কিছু একটা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি, যখন সেটা পাচ্ছি সাথে সাথে তা মলিন হয়ে যাচ্ছে। নতুন আরও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগছে। এভাবেই চলছে চাওয়া-পাওয়ার খেলা। মজার ব্যাপার হলো, এই পাওয়ার অনুভূতি আমাদের সুখ দেয় না। সুখ দেয় যা পেয়েছি তা নিয়ে শুকরিয়া করলে, কৃতজ্ঞ হলে। শোকরগুজার অন্তর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের চারপাশের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রতিটা সম্পর্ক, প্রতিটা দিন—সবকিছুতেই অন্তত একটি হলেও মালিকের শুকরিয়া করার মতো বিষয় থাকে। আশেপাশে তাকালে দেখবেন, এমন একটি জিনিসও নেই যেখানে মাবুদের প্রশংসা করার মতো কোনো বিষয় থাকে না। এগুলো যেন আমার নজর এড়িয়ে না যায়।

নাস্তিকদের খুব সাধারণ একটা বুলি—তোমাদের আল্লাহর এত কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন হয় কেন? ইসলাম বলে, তুমি কৃতজ্ঞ হলে তোমার মালিকের কোনো লাভ হয় না, এতে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হয়। আজ থেকে আপনি কোনো কোনো বিষয়ের কৃতজ্ঞতা নিয়মিত নোট করলে দেখবেন, দুনিয়াতে থেকেও জান্নাতের সুখ পাচ্ছেন।

১০. অতীতের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট, অপ্রাপ্তি থেকে অনেকেই হীনম্মন্যতায় ভোগেন। সবকিছুতেই কেমন যেন ভয় ভয় লাগে, সাহসে কুলায় না। কিন্তু 'সাহস' জন্মগত কোনো বৈশিষ্ট্য না। অনেকটা মাংসপেশির মতো, যত অনুশীলন করবেন তত বাড়বে। হীনম্মন্যতায় ভোগার কারণে বউ-মা সহজে সংসারে সংযুক্ত হতে পারে না আর শাশুড়ি-মায়েরাও সহজে বউকে আপন করতে পারে না। শাশুড়ি-মায়ের মনে ভয় হয়, সংসারে বউ-মা এসে নায়িকার চরিত্রে থাকবে নাকি খল-নায়িকার

২৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪৮, ১০৫০

চরিত্রে থাকবে? সংসার বুঝি হাত করে নেবে? বউ-মার মনে ভয় হয়, এটা করলে, এভাবে করলে, এভাবে চললে শাশুড়ি-মা আবার কী মনে করবে? বকাঝকা করবে কি না? মেনে নেবে কি না? শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের মানুষদের এসব আজেবাজে ভয় থাকে না। চেষ্টা করতে হবে সৎসাহসের শরীয়তসম্মত সঠিক ব্যবহার শিখতে। আরেকটি চিন্তা আমাদের জ্বালিয়ে মারে, তা হলো 'কুধারণা'। 'ও মুখে এটা বলছে, কিন্তু মনের ভেতরটা ঠিকই হিংসায় ভরা!' সবাই যেন অন্তর্যামী হয়ে বসে আছে! কিছু দেখে তা থেকে আরও কিছু আন্দাজ করা, ধারণা করা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এটা আমাদের সতর্কতা নাকি কুধারণা?

আমাদের সবার জীবনে এ ধরনের কিছু না কিছু ঘটনা থাকে। শাশুড়ি বউ-মার সম্পর্কে কুধারণা করে, বউ-মা শাশুড়ি সম্পর্কে কুধারণা করে। বউ-মা সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠলে শাশুড়ি ধারণা করে, সংসার উচ্ছন্নে যাবে, শেষকালে হয়তো আমার ছেলেকে দিয়েই নাস্তা বানিয়ে খাবে। মেয়ে সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠলে ওই একই শাশুড়ি-মা ধারণা করেন, রাতে হয়তো ঘুম হয়নি, এখন ঘুমাচ্ছে, একটু ঘুমাক, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বউ-মার ক্ষেত্রে ধারণা একরকম, মেয়ের ক্ষেত্রে ধারণা করছে আরেক রকম। এসব ধারণার ক্ষেত্রে আপনি কি সতর্ক থাকতে পারছেন? নাকি যা মন চাচ্ছে তা-ই ধারণা করছেন? আপনার ধারণা কি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য? এই ধারণার ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকছে?

মদ খেলে মানুষ যেমন মাতাল হয়, তেমনই কুধারণা করতে করতেও মানুষ মাতাল হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কয়েকজন একসাথে হলেই অন্যের সম্পর্কে বাজে চিন্তা না করে থাকতেই পারে না। সংসারের প্রতিটা কোণকে বিষাক্ত করে তোলে এই 'কেনি-ভূত'। যখন মনের মধ্যে শতবার কুধারণা হয়, একবার হয়তো তা প্রকাশ পায় পরনিন্দা, পরচর্চা বা গীবতের আকৃতিতে। প্রথমেই কেউ কারও গীবত করে না, প্রথমে করে কুধারণা। তারপর তা শব্দে প্রকাশ পায়। এই কাজটা আপনাকে দুনিয়াতে থেকেই দোযখের স্বাদ দেবে।

সূরা হুজরাতের মহান মালিক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের সতর্ক করে ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা অতিরিক্ত ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু ধারণা গোনাহ। এবং (অন্যের) গোপনীয় বিষয় সন্ধান কোরো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[২৮]

ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সাথে আচরণ করেন। আপনি যদি মনে করেন শাশুড়ি আপনাকে অনেক ভালোবাসে, তবে আপনি শাশুড়ির সব কাজের মধ্যে আপনার প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাবেন। শাশুড়ি-মা যদি মনে করেন তার বউ-মা খুব পরিশ্রমী, তবে তিনি তাকে সেভাবেই দেখতে পাবেন। অথবা শাশুড়ি-মায়ের ভালো ধারণার কারণে একসময় বউ-মা বাস্তবিকই পরিশ্রমী হয়ে যাবে। আপনি যখন Self love (আত্মপ্রেম) অনুশীলন করবেন, তখন মানসিক যত্নের স্বার্থে এ ধরনের চিন্তা চেতনাকে আগলে রাখো।

১. (খ) নিজস্ব দায়িত্ববোধ (Self-Responsibiity)

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আর ব্যস্ততার কারণেই হোক, Self এর যে উপাদানটি অনেক পরিবারেই অমাবস্যার চাঁদের মতো তা হলো 'দায়িত্ববোধ'। আমাদের নিজেদের ভালো থাকার ওপরে এই দায়িত্ববোধ কীভাবে পাখা মেলে আছে সেসব নিয়েই কথা হবে এই অংশে।

আমাদের পরিবারগুলো মা-বাবা, স্ত্রী-স্বামী, সন্তানাদি, নানা-নানি, দাদা-দাদি নিয়ে সাজানো। এই সদস্যগুলো সবাই যখন তার নিজেদের দায়িত্বগুলো বুঝে নেয় তখন ঘরের পরিবেশ আপনা-আপনিই শান্তিময় হয়ে যায়। কিন্তু যখন এর ব্যতিক্রম ঘটে তখন?

২৮. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ১২

আশেপাশে একটু তাকালেই আপনি দেখতে পাবেন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা কারও সময় নেই, সবাই নিজেকে নিয়ে মহাব্যস্ত। নিজের কাজই তো শেষ হয় না, এত শত দায়িত্ব পালনের সময় কই!

এ ছাড়া অধিকাংশ পরিবারে দায়িত্ব বণ্টনেও ভুল থাকে—কার কী দায়িত্ব, কার কতটুকু দায়িত্ব, ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য কেমন হবে সে বিষয়েও কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে ঘরগুলোতে। একজন সংসারের জন্য করে করে হাঁপিয়ে উঠছে, আরেকজন হয়তো তেমন কিছুই করছে না। আবার একজন হয়তো অনেক অবদান রাখছে, কিন্তু সংসারের কেউ তার স্বীকৃতিও দিচ্ছে না।

সংসারের মধ্যে এটা খুব কমন একটা অভিযোগ যে, 'আমি তো অনেক করলেও তারা খুশি না!' অনেক শাশুড়ি আছেন যারা শত দায়িত্ব পালন করেও বউ-মাদের খুশি করতে পারেন না, আবার অনেক বউ-মা আছেন যারা শত চেষ্টাতেও শাশুড়ির মন জয় করতে পারেন না। কিছু না করলে দোষ–কেন করোনি? কিছু করলে দোষ–এভাবে করেছ কেন? এটা করেছ তো ওইটা করোনি কেন? এইভাবে কেন করোনি? ইত্যাদি হাজারো দোষ ধরাধরি খেলা শুরু হয়!

আবার অনেকে থাকেন ভীষণ Egocentric। উনারা নিজেদের অনেক বড় মনে করেন, তাদের ইগো অনেক বেশি, সবাই তার চাওয়া-পাওয়া পূরণ করবে; কিন্তু তিনি কারও ব্যাপারে দায়িত্ব নেবেন না। ঘরে একজন Egocentric মানুষ থাকলেই পারস্পরিক দায়িত্ববোধ নাজুক হয়ে যায়। এর সাথে সাথে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে চরম প্রভাবিত ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা তো আছেই–মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো!

আমরা সবাই বুঝি–কী পেলাম, আমার কী পাওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী অধিকার আমার আছে সব জানি, সব বুঝি।

কিন্তু জানতে ভালোও লাগে না, বুঝতেও ইচ্ছে করে না–কী দিলাম, আমার কী দেয়া উচিত? কোন কোন ক্ষেত্রে আমার কী কী দায়িত্ব আছে?

অধিকার খুব জানি, কিন্তু দায়িত্বগুলো ভাসাভাসা!

এ ছাড়া দায়িত্বশীলতার মজার এক স্বরূপের দেখা মেলে আমাদের সমাজে।

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।'[২৯]

এই বাক্য থেকে অনেক পিতা তার সন্তানাদিকে বোঝায়, খবরদার পিতাকে কখনো অসন্তুষ্ট করবে না, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সবাই মিলে আমাকে সন্তুষ্ট রাখবে। আমি অসন্তুষ্ট হলেই কিন্তু শেষ, তোমার সব শেষ। পিতা মনে করে, সবাই তাকে সন্তুষ্ট করবে!

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا' (ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা)। অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[৩০]

আবার অনেক মা মনে করে, তুমি যতই সদ্ব্যবহার করো না কেন, তা তোমার জন্য যথেষ্ট নয়! এক ফোঁটা দুধের দাম তো দিতে পারবা না। হাজার দিয়েও ঋণ শোধ করতে পারবা না। এ জন্য অনেকে চাইতেই থাকে চাইতেই থাকে।

অন্যদিকে স্বামী মনে মনে ভাবে, স্বামী যে স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট সে জান্নাতী হবে। তাই স্বামী চায় স্ত্রী যেন তাকে সন্তুষ্ট রাখে।

আর স্ত্রী মনে করে, সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে পরিবার-পরিজনদের কাছে সর্বোত্তম। তাই স্ত্রী ভাবে, পুরুষ, তোমরা যদি উত্তম হতে চাও তাহলে ঘরের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করো।

ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছিল, কুরআনের আয়াত বা হাদীস থেকে আমরা যেন আমাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হই; নিঃসন্দেহে এগুলো অসাধারণ অনুপ্রেরণা। সুবহানাল্লাহ। তারপরও কতক মানুষ ইসলামের এই মহিমান্বিত শিক্ষাগুলোকে তাদের অধিকার আদায়ের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সামনে ইসলাম, পেছনে স্বার্থ।

নিঃসন্দেহে কোনো ছাড়াছাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়া সকলের প্রতি দায়িত্ব পালন

---

২৯. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৯৯। সহীহ।

৩০. সূরা ইসরা/বনী ইসরাঈল, (১৭) : ২৩

করা, অধিকার প্রদান বা হক আদায়ের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা প্রশংসা করার মতো একটি বিষয়। সমাজে খুব কম মানুষই অধিকার আর দায়িত্বের হিসাবে দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে পারেন।

অনেক বউ-মা মনে করেন, আমি তো সবাইকে খুশি রাখতে পারব না; তাই যাক, সব গোল্লায় যাক! আবার অনেক বউ-মা সবাইকে খুশি রাখতে গিয়ে নিজের দিকে তাকানোরই সুযোগ পান না। দেখা গেল শাশুড়ির সব হুকুম শোনায় দশে দশ; কিন্তু নিজের ছেলে-মেয়েকে শেখানো-পড়ানোর সময় নেই। বাচ্চার সাথে খেলার সময় নেই। একজনকে খুশি করতে গিয়ে আরেকজনের ওপর জুলুম।

শাশুড়ি দেখা গেল বউমাকে দায়িত্ব শেখানোর ব্যাপারে খুবই উদগ্রীব, কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালনের দিকে খেয়ালই থাকছে না। বউ-মাকে খুব শেখাচ্ছি-শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে থাকতে হয়! কিন্তু শাশুড়ি-মা'ই দেখা যাচ্ছে তার ননদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমাদের নিজেদের কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে কি না সে ব্যাপারে খেয়ালটা অনেক বেশি থাকা দরকার। সংসারের শাশুড়ি-মায়ের কী কী দায়িত্ব আছে সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করা হবে! বউ-মার কী কী দায়িত্ব আছে সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করা হবে! প্রশ্ন এক রকম হলেও একেকজনের কাছ থেকে উত্তর আলাদা আলাদা করে নেয়া হবে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন না—তারা কি মনে করে তাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?[৩১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

---

৩১. মূল আয়াত হলো, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা তো ঈমান এনেছি' বলেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' -সূরা আনকাবুত, (২৯) : ২

> 'মনে রেখো তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাদের ওপর দায়িত্বশীল। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানদের ওপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের ওপর দায়িত্বশীল। সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৩২]

অনেকে হয়তো বলবেন, সবকিছু তো বেশ চলছে। কেন আবার দায়িত্ব নিতে হবে? আমি কোনো দায়িত্ব নেব না। তবে সময়ের ব্যবধানে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি একা হতে শুরু করেছেন। সম্পর্কের সুতাগুলো আলগা হতে শুরু করেছে। নিজের প্রতি ভালোবাসা কমতে শুরু করেছে। মানুষ যখন দায়িত্ব নেয় তখন সে তার মনের গভীরে খুব ভালো থাকে। অপর পক্ষ থেকে কোনো সারা না আসলেও তার মনে অসম্ভব এক তৃপ্তি থাকে। হয়তো দায়িত্ব পালন করতে সাময়িক একটু কষ্ট হতে পারে, কিন্তু চিরজীবন ভালো থাকার অনেক উপকরণ তখন খুঁজে পাবেন।

এখানে আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটে। অমুক আত্মীয়ের জন্য আমার কাজটা করা উচিত, কিন্তু থাক আমি করব না, ইচ্ছা করছে না বা ঝামেলা নেব না, যাই হোক। শেষে আপনার আর করা হলো না। এই কর্তব্য কাজটা নিরন্তর আপনার ভেতরে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। বারবার মনে হবে, কাজটা করলেই হয়তো ভালো হতো, কেন যে করলাম না। নিজেকে অপরাধী মনে হবে, হীনম্মন্যতা ঘিরে ধরবে। ভেতরে কেমন যেন খুঁতখুঁত করে এসব না-করা করণীয় কাজগুলো। দায়িত্ব পালনের আগে যেমন যা-ই মনে হোক, 'করা উচিত' ভেবে করে ফেলা বেশি নিরাপদ। শাশুড়ি বা বউ-মার পরস্পরের প্রতি যেমন আচরণ করা উচিত বা যতটা দায়িত্ব পালন করা উচিত, সেটা করা সবচেয়ে নিরাপদ। এভাবেই আমরা ভালো থাকি, আনন্দে থাকি।

শাশুড়ি-মায়ের উচিত বউ-মাকে বউ-মা হিসেবে মর্যাদা দেয়া, বউ-মাকে সহজ-স্বাভাবিক একটি পরিবেশ উপহার দেয়া। আর বউমারও উচিত সহজ-স্বাভাবিক পরিবেশে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা।

---

৩২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯

এ ক্ষেত্রে একটু সংযোগ করতে চাই। অনেক বউ-মা হয়তো বলবেন, দায়িত্ব আছে স্বামী ও তার সন্তানাদির প্রতি, শ্বশুরবাড়ির প্রতি নয়। শ্বশুরবাড়ির প্রতি যদি আমি কিছু করি, তবে সেটা 'দয়া'!

একমত, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলেমিশে থাকা, স্বামী ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়; 'দয়া বা ইহসান'। কিন্তু একটু ভেবে দেখা দরকার, এই দয়া-অনুগ্রহ এই জিনিসটাকে একপাশে রেখে শুধু দায়িত্ব-অধিকার দিয়ে দুনিয়াটা চলে কি না? যেকোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান শুধু এই দায়িত্ব-অধিকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না? আল্লাহ তাআলার এই গুণবাচক বৈশিষ্ট্যটি ছাড়া দুনিয়াতে একমুহূর্ত নিজেকে কল্পনা করা যায় কি না?

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফি. তার ইসলাহী মাজালিস কিতাবে উল্লেখ করেছেন, একবার শায়খ ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, একবার আজান হচ্ছিল, তখন একজন আলেম কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কেউ বলল, হুজুর আজান হচ্ছে এখন কথাবার্তা না বললেই ভালো। সেই আলেম বললেন, 'হ্যাঁ জানি, আজানের জবাব দেয়া ফরজ-ওয়াজিব নয়।'[৩৩]

যেন যে কাজগুলো ফরজ-ওয়াজিব নয় তা করণীয়ও নয়। কোনো ফযীলতও নেই। এমন ইলম তো বড় নীরস ইলম, যা শুধু আইনের কাজ করায়। ইশক ও মহব্বত এবং প্রেম ও ভালোবাসারও যে একটা দাবি আছে, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

শুধু আইন প্রণয়ন করেই যেমন অপরাধ দূর করা যায় না, তেমনই শুধু দায়িত্ব আর অধিকারের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে সংসারে সম্মানের সাথে জায়গা করা যায় না। ভালোভাবে বাঁচতে মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ সবারই লাগে।

আমাদের প্রকাশভঙ্গিগুলো যেমনই হোক না কেন, শাশুড়ি-মা চায় বউ-মা তাকে ভালোবাসুক আর বউ-মা চায় শাশুড়ি-মা তাকে ভালোবাসুক। আমরা কামনা করি, এই দুইটি সম্পর্ক তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের

৩৩. ইসলাহী মাজালিস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১৩

কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসাগুলো ফিরে পাক।

দুই ধরনের দায়িত্বশীলতা আমাদের ঘিরে আছে :

প্রথমত, নিজের প্রতি দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, অন্যদের প্রতি দায়িত্ব।

নিজের প্রতি দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে Self love অংশটি পুনরায় পড়তে পারেন। আর অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে কীভাবে আমরা আমাদের সচেতনতাকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারি, এ সম্পর্কে নিচে কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. অন্যদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে চাইলে প্রথমে যে তালিকা আমার সামনে থাকা দরকার তা হলো, কার জন্য কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সরণি ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব পালনে আমার সঙ্গী হবে।

২. আমি আমার সম্পর্কগুলোকে যেমন দেখতে চাই, সেভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে কোনটা পাওয়ার জন্য কোনটাকে ছাড় দেব, সেই সিদ্ধান্তেও আপনাকে স্বচ্ছ হতে হবে। এই পরিকল্পনা দায়িত্বশীলতার বোঝা হালকা করে দেবে।

৩. আমাদের চারপাশে যত কাজকর্ম আছে তার মধ্যে কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে আর কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলোর একটা তালিকা আর যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেগুলোর আরেকটা তালিকা করা দরকার। আমাদের যত রকমের চিন্তা-জল্পনা-কল্পনা সবকিছু হবে এই নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থাকা বিষয়গুলোকে নিয়ে।

৪. মাঝে দায়িত্বের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন থাকা খুবই জরুরি। কার কী দায়িত্ব, কার কী কী কাজ পরিষ্কারভাবে সবাই সেটা জানবে। কে কী কাজ করবে এবং কীভাবে অপরজনকে সাহায্য করবে সে সম্পর্কিত পারিবারিক নিয়ম ঘরের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্বশীলতাকে বৃদ্ধি করে।

৫. কোনো কাজ করার পর আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে।

৬. অন্যের কী করণীয়, কে তার দায়িত্ব পালন করল কি করল না সেসব নিয়ে দিগ্‌বিদিক চিন্তা না করে তর্জনী বা শাহাদত আঙুলি নিজের দিকে ইঙ্গিত করা ভালো।

৭. কোনো দায়িত্ব নেবার পর স্বীকৃতি বা প্রশংসা না পেলে সেই কাজে নিয়মিত থাকা নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে জয়ী হতে চাইলে ইচ্ছাশক্তি (Will Power) এর সাথে Why Power-কেও কাজে লাগাতে হবে। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, কেন দায়িত্বশীল হতে চেয়েছিলাম? দায়িত্বশীল হওয়ার মাধ্যমে সম্পর্কগুলো যেভাবে মেরামত করতে চেয়েছিলাম তা কি হয়ে গেছে? সাহস করে দায়িত্ব নেয়া বা দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা মূলত আমাদের নিজেদের প্রতি ভালোবাসাকেই বাড়ায়, আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। দায়িত্বশীলতা জন্মসূত্রে পাওয়া বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো বৈশিষ্ট্য না। আপনি যত এর যত্ন নেবেন ততই শক্তিশালী হবে।

১. (গ) দায়বদ্ধতা (Self-Accountibility)

আপনি যখন আপনার নিজের বা আপনার সম্পর্কগুলোর যত্ন নেবার তাগীদে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আরেকটু ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে চাইবেন, তখন Self এর যে উপাদানটি আপনাকে Track এ ধরে রাখতে সাহায্য করবে তা হলো 'দায়বদ্ধতা'।

জবাবদিহি বা দায়বদ্ধতার কথা যখন আসে তখন কয়েক ধরনের মনোভাব আমাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন : নিজেকে সমস্ত অভিযোগ বা দায় থেকে মুক্ত রাখার জন্য সব দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো। এই নীতিতে বিশ্বাসী কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনার আজকের যে অবস্থা–শারীরিক, মানসিক পারিবারিক, অর্থনৈতিক যেমনি হোক–তার জন্য কে দায়ী? এই ধরনের প্রশ্ন শুনলে বর্তমান অবস্থায় যা যা অর্জন করতে পেরেছে তা তাদের মাথায় আসে না! প্রথমেই মাথায় আসে কী কী অর্জন করা যায়নি বা কোন কোন বাধার কারণে এমনটা ঘটেছে! জীবনের অন্ধকার দিকটা নিয়ে ভাবতে থাকে। পরিবার, পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার সবকিছুর দোষারোপ করে। কিছু খুঁজে না পেলে সিস্টেমের দোষ দিতে থাকে। আর সব শেষে নিজের ভাগ্যের ওপর দোষ চাপানো তো আছেই।

আবার আরেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, যা কিছু হয় সব আমার কারণেই হয়; অনেকটা 'ওভার ভিকটিমাইজেশান' এর মতো। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এত বেশি হীনম্মন্যতা কাজ করে যে, সে কখনো মুখ উঁচু করেই দাঁড়াতে পারে না। দায়বদ্ধতা মানে এই না যে সব দায়িত্ব নিজের করে নিতে হবে, যে যা বলবে সেটাই জি হুজুর জি হুজুর করে শুনতে হবে। দায়বদ্ধতা মানে এও না যে সংসারে খারাপ যা হয় তার সমস্ত দায় আপনার!

'কোনো দোষই নেব না বা সব দোষই কাঁধে তুলে নেব' এটা নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা না; বরং আমি যা করি বা আমার সমস্ত আচরণের মালিক আমি। হ্যাঁ, আমি চিল্লাচিল্লি করছি, বলছি অমুক আমাকে রাগিয়ে দিয়েছে, অমুকের আচরণের কারণে আমি রাগ করেছি, অমুকের কারণে আমি চিল্লাচিল্লি করছি– এভাবে না। হ্যাঁ, আমার রাগ হয়েছে, এটা আমার একটা আবেগ, এই আবেগের ফলে আমি কেমন ব্যবহার করছি সেটা আমারই নিয়ন্ত্রণে। আমার সমস্ত ব্যবহারের দায় আমার।

Self Responsibility তে আলোচনা করা হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের নিজেদের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে, সাথে সাথে অন্যদের প্রতিও কিছু দায়িত্ব আছে। এই সমস্ত দায়িত্বগুলো আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারছি কি না এটা মনিটরিং করা হলো দায়বদ্ধতা। দেখা গেল আমি আগে দায়িত্ব পালনে দশে চার পেতাম, এখন চাচ্ছি কীভাবে দশে আট-নয় পাওয়া যায়। এই যে নিজেকে আরেকটু উন্নত করতে চেষ্টা করা, আরেকটু ভালোর দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং এই ভালোটুকুকে ধরে রাখার জন্য নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা দরকার। দায়বদ্ধতা অনেকটা Self এর মেন্টর-এর মতো। আপনি পা ফসকে যেতে চাইলেও আপনাকে পড়ে যেতে দেয় না। ভালো একটি অভ্যাস গঠন করার জন্য দুই দিন চেষ্টা করলাম আর তিন দিন গা-ঝাড়া দিয়ে থাকলাম—এসব গড়িমসির গর্ত থেকে হাত ধরে টেনে বের করে আনে দায়বদ্ধতা। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের ইস্তিকামাত এর ভুবনে নিয়ে যায়।

তাযকিয়ার মেহনতে এই বিষয়টাকে বলে মুহাসাবা। সারা দিন কী করলাম না করলাম রাতের বেলা তার হিসাব লাগানো। কোন কাজটা ঠিক হয়েছে, কোনটা ভুল হয়েছে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করা হলো মুহাসাবা। এরপর ভুল থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া হলো মুহাসাবার

হাকিকত। মুহাসাবার বৈশিষ্ট্যকে আপনার মধ্যে এনে দেবে এই দায়বদ্ধতা।

মুহাসাবাতুন নাফস তথা আত্মবিবেচনা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাকওয়ামুখী মুমিনদের জীবনে মুহাসাবা এক অবশ্য-কর্ম। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আপন কিতাবে এ বিষয়ে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আর (তোমাদের) প্রত্যেকের উচিত, আগামীকালের (আখিরাতের) জন্যে সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা (মুহাসাবা) করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।'[৩৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উমর রাযি.-এর একটি বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'তোমাদের ওপর (আখিরাতের) হিসাব ঘনিয়ে আসার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিতে শুরু করো।'[৩৫]

১. (ঘ) সংশ্লিষ্টতা (Self-Attachment)

Self এর দুইটা উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—নিজেকে ভালোবাসা এবং দায়িত্বশীলতা। এই দুইটি উপাদানের মাঝে ভারসাম্য আনা খুবই জরুরি।

আপনি যদি মনে করেন আমি Self Love (আত্মানুরাগ) প্র্যাকটিস করতেই থাকব, কোনো দায়িত্ব নেব না; তবে সময়ের ব্যবধানে আপনি চরম স্বার্থপর মানুষে পরিচিত হবেন। আবার আপনি এত বেশি বেশি দায়িত্ব নিচ্ছেন, সবার সব দায়িত্বের জায়গাটা কেড়ে নিচ্ছেন বা অন্যদের কোনো সুযোগই দিচ্ছেন না; সাথে সাথে অন্যরাও আপনাকে খুব বেশি গ্রান্টেড মনে করে ফেলছে, আর মনে করছে তাদের আর কিছু করতে হবে না–'অমুক তো আছেই'। এটাও খুব ক্ষতিকর।

---

৩৪. সূরা হাশর, (৫৯) : ১৮

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক; আয-যুহদু ওয়ার রকাইক, ৩০৬

এসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে খুব কোমলভাবে 'না' বলাটাও শেখা দরকার।

সংসারের জন্য আমি কতটুকু সহজ-সাবলীল আন্তরিকতার সাথে দিচ্ছি বা কখন হাঁপিয়ে উঠেছি, যতটুক আমি হাঁপিয়ে গিয়ে করছি সেটা আমার আত্মানুরাগ কেড়ে নিচ্ছে কি না তা দেখা দরকার। এসব চিন্তার জায়গাগুলো আমার কাছে পরিষ্কার কি না তা আমাকেই বসে হিসাব-নিকাশ করে বের করতে হবে। সংসার শুরু করার পর নতুন কিছু কিছু বিষয়ের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়, দুর্বলতা তৈরি হয়, এটা অস্বাভাবিক কিছু না; বরং খুবই স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো জিনিসের সাথে বেশি সংশ্লিষ্টতা আছে। কিন্তু সেই সংশ্লিষ্টতায় ভারসাম্যের অবস্থান কেমন বা সেখানে বাস্তবতার কোনো জায়গা আছে কি না? যে বিষয়ের সাথে Attachment সেটা যদি কেড়ে নেয়া হয়, তারপরও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না?

হতাশা বলেন, বিষণ্ণতা বলেন আর আত্মহত্যাই বলেন, সবকিছুর গোড়াপত্তন এই Unhealthy attachment এর হাত ধরেই শুরু হয়। কোনো একটা জিনিসের সাথে আমি খুবই Attached, কোনোভাবে সেটা হাতছাড়া হয়ে গেল, ব্যস, এ জীবন রেখে আর কী হবে! যেমন ধরেন, কিছু কিছু মানুষ আছে ক্যারিয়ার-Attached, দুনিয়ার সবকিছু একদিকে, ক্যারিয়ার আরেক দিকে। ক্যারিয়ার ভালো করতে সে যেমন সবকিছু ছাড়তে পারে, তেমনই ক্যারিয়ার ভালো করতে সে যেকোনো কিছু ধরতেও পারে। ক্যারিয়ারকে সমুজ্জ্বল করতে সে কোনো কিছুর পরোয়া করে না।

কিছু কিছু মানুষ আছে খ্যাতি বা সম্মানে Attached। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তাদের ভাইরাল হতে হবে, খ্যাতি কুড়াতে হবে। খারাপ কিছু করেই হোক আর ভালো কিছু করেই হোক, সমাজের মাঝে পরিচিতি আনতে হবে।

কিছু কিছু মানুষ আছে সৌন্দর্যে Attached। তার কাছে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, স্নেহ করা বা ভালোবাসা—সবকিছুর মানদণ্ড হলো সৌন্দর্য। যার সৌন্দর্য যত বেশি সে তত বেশি পূজনীয়।

কিছু মানুষ আছে সন্তানের ব্যাপারে Attached। তাদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার অস্ত্র হলো সন্তান, প্রতিযোগিতা করে আগে বাড়ার বিষয় হলো সন্তান। এ জন্য

সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে তারা সন্তানের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন।

কিছু মানুষ আছে বাড়ি, গাড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এককথায় টাকার প্রতি Attached। তাদের টাকা লাগবে, প্রচুর টাকা। টাকাটা কীভাবে এল বা কীভাবে আনব সেটা বড় বিষয় না; বড় বিষয় হলো টাকা লাগবে, অনেক টাকা।

কিছু কিছু মানুষ আছে বংশ-মর্যাদায় বা পদবিতে Attached। যার বংশ-মর্যাদা ভালো সে সম্মানিত, তার সাথে ছেলে-মেয়ে বিয়ে দেয়া যায়। যার বংশ-মর্যাদা ভালো না, তাকে ত্রিসীমানায় দেখতে চায় না।

প্রায় প্রত্যেকটি মানুষেরই এই সংশ্লিষ্টতাগুলো থাকে। তবে এর মধ্যে কিছু আছে ভালো আর কিছু খারাপ। এতক্ষণ যে সমস্ত Attachment-গুলো নিয়ে বলা হয়েছে, এগুলো কিন্তু আমাদের জীবনেরই অংশ, ওতপ্রোতভাবে আমাদের সাথে জড়িত। এই বিষয়গুলো ছাড়া সুস্থ-স্বাভাবিক সুন্দর একটি জীবন কল্পনাও করা যায় না। আমরা এই একজন মানুষই কখনো টাকার সাথে Attached, কখনো সম্পত্তির সাথে Attached, কখনো সন্তানের সাথে Attached, কখনো সৌন্দর্যের সাথে Attached । বেঁচে থাকতে এগুলো কোনোটাকেই আমরা বাদ দিতে পারি না। কিন্তু এই attachment-গুলোই কখনো কখনো ভয়ংকর রূপ নেয়। যেমন : সৌন্দর্যের সাথে আমাদের যে Attachment, সেটা যখন ভারসাম্যহীন হয়ে যায় তখন কিছু ভয়ংকর ঘটনা ঘটে।

সুন্দরভাবে থাকা, সাজগোজ করা কার না পছন্দ! মানানসই পোশাক, মানানসই সাজ আত্মবিশ্বাসকে ধরে রাখতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করে। কিন্তু চোখে কাজল না দিলে কারও সামনে যাওয়া যাবে না, ভালো কাপড় গায়ে না থাকলে চলে যাবে, ঠোঁট রাঙানো না থাকলে কথা বলতে জড়তা লাগবে, মুখে মেকআপ না থাকলে বুকে বল থাকবে না—এইসব মনোভাব খুব ভয়ংকর। যারা মনে করে, মানুষের কাছে পাত্তা পাওয়ার উপায় একমাত্র সৌন্দর্য, তাদের জন্য সৌন্দর্য হলো Unhealthy attachment। এই সৌন্দর্যের মাধ্যমেই তারা নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। এই সৌন্দর্যই তাদের আত্মবিশ্বাস পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার। যেভাবেই হোক চেহারার খুঁত ঢেকে রাখতে হবে। কখনো যদি সৌন্দর্যকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়, তবে তারা ভয়ংকর মুষড়ে পড়ে। সৌন্দর্যকে চোখের সামনে ঝুলিয়ে সমস্ত দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখা বা দুর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা না করা তাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এ ধরনের মানুষগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন তাদের বয়স বাড়ে, চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে থাকে, লাবণ্য নষ্ট হতে শুরু করে, তখন উনাদের মধ্যে একধরনের বিষণ্ণতা শুরু হয়। এ কারণেই ফিমেইল সেলিব্রিটিদের মধ্যে বিষণ্ণতার হার বেশি হয়, উনারা স্বাভাবিকভাবেই চেহারা কুঁচকে যাওয়ার ব্যাপারে বেশি ভীত থাকতেন। কারণ চেহারার লাবণ্য চলে গেলে এসব সেলিব্রিটিদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়! শ্রদ্ধা, সম্মান এ বিষয়গুলো খুব কমই দেখা যায়। এক শ'তে বিশ জন হয়তো সেই শ্রদ্ধা পায়। এসব নিয়ে শত শত সুইসাইডের ঘটনা ঘটে। কারণ সৌন্দর্যের সাথে ছিল তার Unhealthy attachment।

Unhealthy attachment এর আরও অনেক নজির আছে। এই যেমন ধরুন টাকা। আজ আছে তো কাল নেই। যার এই টাকার প্রতি অস্বাভাবিক সংশ্লিষ্টতা আছে, তার কাছ থেকে যদি কোনোভাবে টাকা চলে যায়, তবে সে কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কেউ থাকে ক্যারিয়ারে attached। ক্যারিয়ারে কোনো Fall হলেই তার অন্যান্য বিষয়গুলোও খারাপ হতে শুরু করে। ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী সব সম্পর্কগুলো খারাপ হতে শুরু করে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একজন ইসলামিক স্কলারের লেকচার থেকে শুনেছিলাম। উনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ৭০ বছরের বৃদ্ধ একজন লোক ঘোরাঘুরি করত। বৃদ্ধের মাথায় কিছু সমস্যা ছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে বলত, এই খবরদার তোমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের কোনো পেপার সাবমিট করবে না; ওরা খুব খারাপ, তোমাদের সব থিসিস-গবেষণা ওরা রেখে দেবে। তোমাকে ধোঁকা দেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বৃদ্ধের ঘটনা কী। উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে তার থিসিস পেপার রেডি করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পেপারটি হারিয়ে ফেলে। এটার আর অন্য কোনো কপিও ছিল না। পরে লোকটি পাগল হয়ে যায়। এই থিসিস পেপারটির সাথে তার Unhealthy attachment ছিল। তাই পেপারটি হারিয়ে সে আর বেঁচে থাকার মতো কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে পারেনি।

আমাদের চারপাশে যে জিনিসগুলো আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা বাঁচি, এগুলোর মধ্যে কোনো একটা বিষয়ের সাথে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা আশেপাশের

অন্যান্য বিষয়গুলোকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। যেমন : আমি চাকরি করছি, ব্যস্ত, তাই ছেলে-মেয়েকে সময় দিতে পারছি না। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, তাই কারও জন্য কিছু করতে পারছি না। আমি ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি, তাই আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করতে পারছি না। কোনো একটা বিষয়ের সাথে unhealthy attachment থাকলে এটা দায়িত্বশীল হওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। যেটা সময়ের ব্যবধানে আপনার Self love কমিয়ে দেয়। জীবনের বড় একটা দিক এলোমেলো হয়ে যায়। হয়তো এই জন্যই অনেক ধনী মানুষের মৃত্যুর আগের কিছু আফসোস এরকম হয়—ইস, টাকার পেছনে এতটা না ছুটে যদি ছেলে-মেয়ের সাথে আরেকটু বেশি সময় কাটাতে পারতাম, ওদের নিয়ে যদি ঘুরতে যেতে পারতাম!

যেকোনো খারাপ সংশ্লিষ্টতা আমাদেরকে দায়িত্বশীল হতে বাধা দেয়; দায়িত্বে অবহেলা আমাদের নিজেদের অপরাধবোধ বাড়িয়ে তোলে, তখন নিজেকে ভালোবাসা কঠিন হয়। আমাদের আশেপাশে যে বিষয়গুলো আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা চলি, সেগুলোর কোনোটাকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা, ব্যাকুল হয়ে সেখানেই নিজেকে আটকে রাখা যাবে না। জীবনের কোন ধাপে কখন কোনটা করা দরকার গুরুত্ব বুঝে, গুরুত্বের ক্রমানুসারে একসাথে সবকিছু চালিয়ে যাওয়াই ভালো। তাহলে পরে আফসোসের কারণ কম ঘটে।

সত্যি বলতে কি, আমরা যে সমস্ত জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট, সবকিছুই খুব দুর্বল। আমরা যা চাই তাও খুব দুর্বল, যা পেয়েছি সেগুলোও খুব দুর্বল, যা হারাই সেগুলোও খুব দুর্বল, খুব নশ্বর, খুব ভঙ্গুর, খুব নাজুক। এর জন্য কিছু পেলে খুব বেশি আনন্দেরও কিছু নেই, আবার কিছু হারালে খুব বেশি কষ্টেরও কিছু নেই। এই পৃথিবীর সবকিছুই এ রকমই ক্ষণস্থায়ী।

তাদের আসলে অনেক বুদ্ধি, যারা চিরস্থায়ী জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্টতা তৈরি করে। চরম শক্তিশালী কিছুর সাথে সংশ্লিষ্টতা তৈরি করে, যা কখনো হারিয়ে যায় না। তারা কার্যত বিশ্বাস করেন,

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৩৬]

৩৬. সূরা বাকারা, (২) : ২০

১. (ঙ) আত্মনিয়ন্ত্রণ (Seft-Control)

Self love উপাদানটির যত্ন নেয়ার স্বার্থে আপনি মনে করলেন, যা করতে ভালো তা-ই করব। মোবাইলে গেম খেলতে ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে, গেম খেলতেই থাকব। কাচ্চি খেতে মজা লাগছে, ব্যস, সপ্তাহে সাত দিনে চার দিন শুধু কাচ্চিই খাব। আমার ভালো লাগছে তো। আমি তো Self care করছি। যা করলে মন ভালো লাগছে তা-ই করছি।

আমাদের Self এর যে চারটি উপাদান সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থাৎ Self love, Self responsibility, Self accontiblity, Self attachment—এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি খুবই সচেতন, কিন্তু আমি জানি না এই সচেতনতা কতদূর পর্যন্ত আমার জন্য ভালো। কীভাবে Self love অনুশীলন করলে আমি স্বার্থপর মানুষে পরিণত হব না, কীভাবে দায়িত্ব পালন করলে আমি কখনো হাঁপিয়ে উঠব না; কোন ধরনের দায়বদ্ধতা আমার জন্য ভালো, কতটুকু সংশ্লিষ্টতা আমার জন্য নিরাপদ—এই সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে বের হতে যে উপাদানটি আমাদের সাহায্য করবে তা হলো 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'।

মুখে বলা সহজ হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণ এত সহজ বিষয় না। তাকওয়া, পরহেজগারীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এটি। ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, 'কোনো কিছুকে সংশোধন করতে আমার এত বেশি সংগ্রাম করতে হয়নি, আমার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমার যত বেশি কঠিন লেগেছে; কখনো আমি জয়ী হই, কখনো হই পরাজিত।'[৩৭]

আশপাশের সব ভালো মানুষদের মধ্যে অন্যতম অসাধারণ একটা গুণ হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ। হয়তো ভালো কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে Self control এই উপাদানটি নেই। জীবনের সব জায়গায় একটা Pause বাটন থাকে। সচেতন মানুষরা জানেন কখন এই Pause বাটনে ক্লিক করতে হয়। আমাদের চিন্তা-চেতনায় অসংখ্য চাওয়ার ভিড়ে তলিয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে self এর যে উপাদানটির যত্ন বিশেষভাবে নিতে হবে তা হলো 'self control'।

কোথায় নেই? আত্মনিয়ন্ত্রণ আসলে কোথায় নেই? ভালো কাজ করতে যাবেন সেখানেও আত্মনিয়ন্ত্রণ, যেন তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে না যায়; আবার কোনো খারাপ কাজ করার আগে সেখানেও আত্মনিয়ন্ত্রণ।

---

৩৭. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৫

পরিবারের মধ্যে ভালো ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে হলে, ভালো বাবা, ভালো মা, ভালো ভাই-বোন, ভালো ছেলে-মেয়ে, ভালো শ্বশুর-শাশুড়ি হতে চাইলে, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাচীর ততটাই জোরদার করতে হবে।

বউ-মা অপরাধ করেছে, তাকে যা ইচ্ছে তা-ই বলে বকাঝকা করছি; এভাবে বলা উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেসব চিন্তা করারও পরিস্থিতি থাকছে না। ছোট কেউ অন্যায় করেছে, অবশ্যই বড় তাকে শাসন করবেন, তবে সামনে Self control উপাদানটি ঝোলানো থাকবে। তাহলে শাশুড়ি-মা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই বকাঝকা বউ-মার সংশোধনের নিমিত্তে হচ্ছে নাকি মনের ভেতরের রাগ, রেষারেষি থেকে হচ্ছে। এইসব বকাঝকাগুলো তখন আর মনের অজান্তে হবে না।

আবার এসব কথাবার্তা শুনে বউ-মাও যে কী বলতে কী বলছে তার কোনো হিসাব থাকছে না। রাগের মাথায় কিছু একটা বলছে, পরে আবার সেটা নিয়ে আফসোসও করছে। কী করব, রাগের সময় মাথা যে ঠিক থাকে না!

এদিকে বউ-মা যখন শাশুড়ির সম্পর্কে কথা বলেন, সেই কথোপকথন কি ভেন্টিলেশন বা শেয়ারিংয়ের জন্য হচ্ছে নাকি পরনিন্দা-পরচর্চার খাতিরে হচ্ছে? অন্যের দোষকে সামনে রেখে নিজের দোষ ঢাকতে ভালো লাগে, তাই বলে কি অন্যের ঘাড়ে দোষ দিয়েই যাচ্ছি? আবার এই যে দেখুন, আমাদের বাচ্চারা যখন দুষ্টামি করে, আমরা মায়েরা শাসন করছি; অপরাধ করেছে দুই আনা, মারধর বকাঝকা করছি দশ আনার। অথবা অপরাধ করেছে দশ আনার, শাসন করছি এক আনার। যথাযথ থাকছে কিছুটা আর অনিয়ন্ত্রিত আবেগের হাতে থাকছে কিছুটা। এ ধরনের ঘটনা আমাদের ঘরগুলোতে ঘটে।

নিঃসন্দেহে সারাদিন আমাদের চারপাশে হাজারো ঘটনা ঘটে। কোনোটাতে আমাদের ভালো লাগে, কোনোটাতে খারাপ লাগে, দুঃখ বাড়ে বা রাগ হয়। কখনো অভিমান করি, হতাশ হই। যেমন ধরুন, কেউ একজন আপনাকে বকা দিল বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিছু বলল, আপনার প্রিয় কেউ আপনাকে কষ্ট দিল, এখন আপনি কী প্রতিক্রিয়া দেখাবেন? আপনার অভিব্যক্তি কেমন হবে? প্রথমে যেটা মাথায় আসে তা হলো, বাইরে থেকে যেমন ক্রিয়া এসেছে প্রতিক্রিয়া সেই আদলেই হবে। আপনিও পাল্টা বকা দিতে পারেন, রেগে চিল্লাচিল্লি করতে

পারেন। রাগের প্রতিক্রিয়ায় রাগ, বকার প্রতিক্রিয়ায় বকা, পিটানোর প্রতিক্রিয়ায় পিটিয়ে সোজা করা ইত্যাদি।

আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমাদের সব রিঅ্যাকশন বাইরের সকল অ্যাকশন দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই আমাদের রিঅ্যাকশনগুলো খারাপ হলে আমরা অজুহাত দেখাই আমাদের সামনে থাকা অ্যাকশনগুলোর।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বাইরে থেকে যত রকমের 'ক্রিয়া' আমার সামনে আসুক না কেন, আমার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা শুধু আমার দখলে। আমি চাইলে রাগঝাল করে বা অভিমান করে সবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিতে পারি। আবার চাইলে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলে সঠিক অপশনটা বেছে নিতে পারি। এই বেছে নেয়ার ওপর আমাদের পুরো জীবনের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। বাইরের ক্রিয়া ও আমার প্রতিক্রিয়ার মাঝখানের সময়টা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে আমি কেমন আচরণ করছি। এ ক্ষেত্রে আপনার রিঅ্যাকশন কি আপনার মায়ের মতো হচ্ছে? নাকি আপনার বাবা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করেন সেভাবে হচ্ছে? আপনার বংশের মানুষরা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করে সেভাবে হচ্ছে? নাকি আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মতো প্রতিক্রিয়া আপনি দেখাচ্ছেন? ঠিক কার মতো?

এভাবে চিন্তা করে আপনার সমস্ত প্রতিক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে আপনার আচরণকে অসাধারণ বানাতে পারেন। পারস্পরিক সম্পর্কগুলো মেরামতের দক্ষ কারিগর হতে যে জিনিসটি আপনার খুবই দরকার হবে তা হলো—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে বুদ্ধিমত্তার সাথে সর্বোত্তম চয়েস বাছাই করা। এই চয়েস বাছাইয়ের সচেতনতাই আত্মনিয়ন্ত্রণ।

অধিকন্তু, এই self control অনুশীলনের জন্য আমাদের একটা Grounding value system আঁকড়ে ধরা দরকার। Grounding value system বলতে বোঝায় নীতি বা আদর্শ, যা সময়-স্থান-কাল-পাত্রভেদে বদলায় না; বরং সব সময়, সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এক ও অভিন্ন। একেকজন একেকভাবে ভ্যালু সিস্টেমকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই ভ্যালু বা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে আপনি যখন সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন সেই মূল্যবোধের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। এসব দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা থেকে আপনা-আপনিই self control এর অনুশীলন হয়ে যায়। self এর অন্যান্য উপাদানগুলোর (self love, self

responsibility, self accontiblity, self attachment) সঠিক ব্যবহার self control এর প্রক্রিয়াকে সহজ করবে।

এই পাঁচটি উপাদান একত্রে আপনার লাইফ এনার্জি বা self কে শক্তিশালী করবে।

২. সমালোচনা বা পারস্পরিক মন্তব্য

বউ-মা এবং শাশুড়ির উভয়ের প্রথম পদক্ষেপ ছিল নিজেকে জানা এবং সচেতনতার সাথে নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া। এরপর আরেকটি সচেতনতার কথা না বললেই না, তা হলো—সততার সাথে সমালোচনা।

আমাদের বউ-মারা যেমন শাশুড়ির সমালোচনা করে, তেমনি শাশুড়ি-মায়েরাও বউ-মার সমালোচনা করে। শাশুড়ি যখন বউ-মার ভালো গুণগুলো নিয়ে কথা বলে তখন বউ-মার ভালোই লাগে। বউ-মা যখন শাশুড়ির ভালো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে তখন শাশুড়িরও ভালো লাগে। নিজের গুণের কথা অন্যের মুখে শুনতে সবারই ভালো লাগে। আর খারাপ বিষয়গুলো নিয়ে সমালোচনা করলে উভয়েরই কষ্ট হয়; স্বাভাবিক।

সারাদিন আপনি হাসিখুশি, ভালো আছেন, হঠাৎ ফোনে বা চ্যাটবক্সে কোনো কটুকথা শুনলেন, ব্যস বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য মনটা ভারী হয়ে গেল। সব উদ্দীপনা শেষ!

আমাদের সমাজে সমালোচনাকে কিছুটা কপাল কুঁচকে দেখা হলেও সব সময় এটা নাক সিটকানোর মতো বিষয় না।

অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনায় খুশি হয়ে আমরা শুধু ধন্যবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হই না; বরং মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকও দিই। এই যেমন ধরুন, প্রকাশনীগুলো বেশ টাকা-পয়সা দিয়ে প্রুফরিডার রাখে, উদ্দেশ্য কী? বইয়ের ভুল খুঁজে বের করে সেটা সংশোধন করা। প্রফেশনালি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অনেকেই ক্যারিয়ার কাউন্সিলর এর শরণাপন্ন হন। যিনি তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেন, সাথে সাথে ভুল সংশোধনে সহযোগিতা করেন। এই মেন্টরকেও মোটা অঙ্কের

ফি দেয়া হয়। সমালোচনা খারাপ না, খারাপ তখনই হয় যখন এটা ভুলভাল উপায়ে করা হয়।

অধিকাংশ মানুষই তাদের পছন্দমতো উপায়ে সমালোচনা করেন। যেভাবে বলতে ইচ্ছা হয় সেভাবে বলেন। এই যেমন অনেকে বলেন, যা বলার আমি সামনাসামনি বলি, আড়ালে কিছু বলে বেড়াই না; আড়ালে বলার অভ্যাস আমার নেই।

কিন্তু সামনাসামনি এমনভাবে বলেন, কলিজাটা যেন চিরে যায়। হয়তো বলবেন, ভুল তো ধরিয়ে দিতে হবে। অবশ্যই ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে, বড়দের ভুল কীভাবে ধরিয়ে দিতে হয়, ছোটদের ভুলগুলো কীভাবে বুঝিয়ে বলতে হয়। ভুল ধরিয়ে দেয়া বা সামনাসামনি সমালোচনার তো কিছু আদব বা উপায় আছে। নিঃসন্দেহে এসবে কিছু জানার আছে।

অনেক শাশুড়ি আছেন যারা বউকে কড়া শাসনে রাখতে পছন্দ করেন, আবার অনেক বউ-মা আছেন শাশুড়িকে কড়া শাসনে রাখতে পছন্দ করেন। এ ক্ষেত্রে বউ-মা বা শাশুড়ি উভয়েরই কিছু কষ্টের জায়গা তৈরি হয়। এই কষ্টের কথাগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করে উনারা নিজেদের দুঃখের বোঝাকে হালকা করতে চান। ভাগাভাগি করলে যেমন আনন্দ বেড়ে যায়, তেমনই অন্যের কাছে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বললেও কষ্ট কমে যায়। এই ভেন্টিলেশন খুবই জরুরি বিষয়। পরবর্তী সময়ে ভেন্টিলেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে ভেন্টিলেশন বা দুঃখ-কষ্ট শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কাদের বাছাই করছি, অবশ্যই সেটা গুরুত্বপূর্ণ। যাকে-তাকে তো আর নিজের ঘরের কষ্টের কথা বলা যায় না। তবে ভেন্টিলেশন বা শেয়ারিং যে নিমিত্তেই হোক, এ ব্যাপারে সচেতনতা কেমন বা কতটুকু তা হিসাব-নিকাশ করার মতো একটি বিষয়।

আমার এসব কথোপকথন বা সমালোচনা কি সততা বা নিষ্ঠার সাথে হচ্ছে, নাকি নিছকই অন্তর্দ্বন্দ্ব বা রেষারেষি, নাকি শুধুই অভ্যাস?

সমালোচনা যদি যথাযথ উপায়ে না হয়, তবে তা পরদোষচর্চা, গীবত, চোগলখোরী বা অপবাদের মতো জঘন্য হয়ে যেতে পারে। লাগামহীন সমালোচনা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। অযৌক্তিক কথায় সমালোচনা অনেক সময় অপর মানুষটির শেষ আত্মবিশ্বাসটুকুও কেড়ে নেয়।

সঠিক সমালোচনা অসাধারণ একটি জ্ঞান। সত্য সমালোচনা থেকে নিজের

কাজের মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কাজের ভালো-মন্দ মূল্যায়ন করতে নিরপেক্ষ সমালোচনা খুবই দরকার। চারদিকে যদি শুধু আপনার নিজস্ব মানুষজন বা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ লোকই থাকে, তবে আপনার কাজের মূল্যায়ন করা আপনার জন্য খুবই কঠিন। যেমন বাবার বাড়িতে থাকার সময় সবই ভালো থাকে, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে আসার পরে এমনটা কমই ঘটে। শাশুড়ি-মাও এভাবেই ভাবেন, কই এতদিন তো সব ঠিকঠাকই ছিল, আর এখন সব দোষই আমার।

কাজের খুঁটিনাটি ভালো-মন্দ কোথায় কতটুকু আছে তা সমালোচনা আপনাকে বলে দেবে। আপনি সমালোচিত হচ্ছেন, তার মানে আপনার কাজ রোজ নতুন নতুন মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের আলাদা মন্তব্য, আলাদা মতামত থাকবে। আর সবারই অধিকার আছে নিজের মতামত প্রকাশ করার। এরই অংশ হিসেবে সমালোচনা কুড়ানোও নিঃসন্দেহে বড় একটি ব্যাপার। গঠনমূলক সমালোচনা নতুন কাজে নতুন মাত্রায় উৎসাহ দেয়।

আবার যদি আপনি প্রতিনিয়ত শুধু প্রশংসাই পেতে থাকেন, এর অর্থ হলো রোজ একই মানুষ অথবা একই বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ আপনার কাজ নিয়ে আলোচনা করছে। আপনার পরিচিত বৃত্তের বাইরেও একটা বৃত্ত আছে, চেনা পৃথিবীর বাইরেও একটা জগৎ আছে। সেই আলাদা মানুষগুলো কী ভাবছে, আপনার প্রতি কিংবা আপনার কাজের প্রতি তাদের কী মতামত, সেটা জানার জন্য আপনাকে সমালোচনার মুখোমুখি হতেই হবে।

অনেকে মনে করেন, 'কী দরকার উটকো ঝামেলা ঘাড়ে নেয়ার, বিয়েই করব না, ভালোই তো আছি!' 'বউ কেমন হবে সে ভয়ে ছেলের বিয়েই দেব না।' উনারা নিজেদের একটা নিরাপদ বলয়ের মাঝে রাখতে চান। শেষমেশ কি রাখতে পারেন? বিয়ে করলেও যেমন দশ কথা মানুষ শোনাবে, না করলেও শোনাবে। তবে এটা ঠিক, কিছু না করলে সমালোচনা কিছুটা হলেও কম হয়।

পাছে সমালোচনা হয় সে ভয়ে কি কিছু করবেন না?

আমেরিকান লেখক, দার্শনিক এলবার্ট হাবার্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে : সমালোচনা এড়াতে চাইলে কিছু কোরো না, বোলো না, হইয়ো না। যার জীবনে কোনো অর্জন নেই, যে পৃথিবী ধ্বংস হলো কি গড়ল এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাকে নিয়ে কেউ সমালোচনা করার তেমন কিছু খুঁজে পায় না। যখনই আপনি

কিছু করতে যাবেন, কিছু একটা বলতে যাবেন, কিছু একটা হতে যাবেন, পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে যাবে। একদল আপনাকে প্রশংসা করবে, আপনি আরও এগিয়ে যান সেই কামনা করবে; আর আরেক দল আপনার মুণ্ডুপাত করবে।

এই যেমন ধরুন, আপনি কোনো গ্রামের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা স্কুল করে দিলেন। দুটি পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে বিশাল প্রশংসাসূচক লেখা ছাপা হতে-না-হতেই অন্য তিনটা পত্রিকায় আপনার নামে যাবতীয় কুৎসা ছড়ানো হবে। পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, করপোরেট শক্তির ইন্ধনে আপনি যে স্কুলের নাম করে তলে তলে 'বিশাল ষড়যন্ত্র' করে বসে আছেন, সেটা নিয়ে অনেক কেচ্ছাকাহিনি ছাপানো হবে। অথচ আপনি শুধু ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার একটা ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন, এটুকুই।

কিছু করলেই আলোচনা-সমালোচনা হবেই। কথা হলো, সমালোচনার ভয়ে দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকছেন কি না; যা করণীয় তা করে যেতে পারছেন কি না, সেটা দেখার বিষয়।

এখন দুইটি চিন্তা।

একটি হলো–অন্য কেউ যদি আপনার সমালোচনা করে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

অপরটি হলো–আপনি কীভাবে অন্যের সমালোচনা করবেন।

এই দুটি চিন্তা নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করতে চাই। এর আগে আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন।

প্রশ্ন : আপনি যে সমালোচনা করছেন তা গীবতের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না তো?

ছেলের বিয়ে দেয়ার পর, প্রায় সব শাশুড়িকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, আপা বউ কেমন হলো? আপা বলেন, ভালোই আছে মোটামুটি; তবে এখানে একটু সমস্যা, ওইখানে একটু সমস্যা। এই সব মিলিয়ে হয়েছে একরকম। যা কপালে ছিল!

আবার নতুন বিবাহিতাকে যখন তার বাবার বাড়ির মানুষজন জিজ্ঞাসা করে, কিরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন? বিবাহিতা বলেন, শ্বশুরবাড়ি কখনো আপন হয় না, পর সব সময় পরই থাকে!

শাশুড়ি-মায়ের ওইসব কথা যদি বউ-মার কানে যায় বা বউ-মার এই মন্তব্য যদি শ্বশুরবাড়ির কারও কানে যায়, তাহলে কি খুব ভালো বোধ হবে নাকি মনোমালিন্য হবে?

নতুন সম্পর্ক, সমস্যা থাকতেই পারে। তবে সবার কাছে ঢালাওভাবে সেটা বলে বেড়ানোর কী মানে? সমাধানের উদ্দেশ্যে যদি বলা হয়, তবে সে পথ তো আলাদা। ভেবে দেখুন তো, আপনার এসব মন্তব্য কি গীবতের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না?

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবিরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গীবত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যে দোষের কথা বলি সেটা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যে দোষের কথা বলো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তবে তুমি অবশ্যই গীবত করলে; আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ।[৩৮]

মনে করেন আপনি রাস্তায় হাঁটছেন। সূর্য ডুবুডুবু অবস্থা। আবছা অন্ধকার। একটু হাঁটতেই দেখলেন আপনার তিন জন বান্ধবী একটা গাছের নিচে বাঁধানো বেঞ্চের ওপর বসে আছে। আপনি সেখানে গিয়ে তাদের সাথে জয়েন করলেন। আপনি খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তারা সবাই মিলে কী যেন খাচ্ছে। প্রত্যেকের সামনে তাদের নিজেদের ভাইয়েরা শুয়ে আছে। ভাইদের শরীরগুলো নিথর, মৃত। বোনেরা পৃথক পৃথকভাবে ভাইদের শরীর থেকে মাংসগুলো খুবলে তুলছে, তারপর মুখে দিয়ে সানন্দে গিলছে। এটা দেখে আপনার গা গুলিয়ে বমি আসল না, ওদের প্রতি ঘৃণাও হলো না; বরং ভালোই লাগল। আপনিও গিয়ে ওদের পাশে বসলেন। হঠাৎ করে খেয়াল করলেন, আপনার সামনেও আপনার অতি আদরের ছোট ভাইয়ের নিথর শরীরটাকে পেশ করা হলো! আপনার মনটা খারাপও হলো না, কান্নাও পেল না। আপনিও দেরি না করে সেই নিথর শরীর থেকে মাংস খুবলে খাওয়া শুরু করলেন!

৩৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৯

কুরআনে এই গীবতের পরিণাম বোঝাতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

'আর তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[৩৯]

অনেকে আড়ালে দোষ বলার সময় বলেন, এ কথা আমি ওর মুখের সামনে বলতে পারব। ব্যস, এই কথা বলেই তিনি তার এই পরচর্চাকে বৈধ করে ফেলেন। আবার অনেকে বলেন, বললে তো গীবত হয়ে যাবে তারপরও বলি। অনেকে ভাবতে পারেন, আমি তো গীবত করি না; অন্যে বলে আমি শুধু শুনি। না, তাদেরও রক্ষা নেই। কারণ তারা গীবতকারীকে সাহায্য করছে এই পাপ কাজ করতে। গীবতকারী গীবত করার জন্য যদি কাউকে না পায়, তাহলে সে আর গীবত করতে পারবে না। আর তাই গীবত শ্রবণকারীদের জন্যও রয়েছে আল্লাহর হুকুম। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত করা যেমন নিষেধ, তেমনই গীবত শোনাও নিষেধ। যে গীবত শোনে সেও গীবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায়।

ধরুন, আপনার ঘরের দুইটি জানালা আছে। একটি জানালার পাশে একটা নর্দমা আছে, আরেকটি জানালার পাশে ফুল বাগান আছে। আপনি যদি নর্দমার পাশের জানালাটা খোলা রাখেন, তবে সেদিক দিয়ে নর্দমার দুর্গন্ধ আসবে। আর যদি ফুল বাগানের দিকে জানালাটা খোলা রাখেন, তবে সেদিক দিয়ে ফুলের সুঘ্রাণ আসবে। ঠিক তেমনিভাবে, আপনি যদি আপনার মনের জানালা কারও খারাপ দোষের দিকে খুলে রাখেন, তবে সেদিক দিয়ে অপরজনের খারাপ দিকগুলোই আপনার ভেতরে আসবে। আর যদি ভালো গুণের দিকে খোলা রাখেন, তবে সেদিক দিয়ে অন্যদের ভালো গুণগুলো আপনার ভেতরে জায়গা করে নেবে।

এখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার হৃদয়ের চোখ দিয়ে অন্যের ভালো বিষয়গুলো দেখবেন নাকি খারাপ বিষয়গুলো?

---

৩৯. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ১২

কোনো মানুষ যখন অন্য আরেকজনের সম্পর্কে আড়ালে কটুকথা বলে তখন বুঝে নিতে হয়, দু-একবার চিন্তা করার দ্বারা এটা মুখ দিয়ে বের হয়নি! বরং ব্যাকগ্রাউন্ডে শত শত বার এসব নিয়ে চিন্তা করেছে।

আমরা তো মানুষ, আমাদের প্রত্যেকের কুপ্রবৃত্তি আছে। চব্বিশ ঘণ্টা চারপাশ থেকে শয়তানের ধোঁকা আছে। প্রশ্নবিদ্ধ সমাজব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে আমার আপনার মাঝে হাজারো দোষ আছে। কোনো মানুষ যখন অন্যের দোষগুলো নিয়ে চিন্তা করে বা নেতিবাচক বিষয়গুলো তার চিন্তায় জায়গা দেয় তখন এই নেতিবাচক বিষয়গুলো ধারণ করতে করতে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভালো চিন্তাগুলোকে তখন আর সুযোগ দেয়া যায় না। এসব আজেবাজে চিন্তা বহুবার মাথায় জায়গা করার পর তা জবানে আসে। আর যা মুখে বলা হয় তা ঝটপট মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাই কোনো মানুষ যখন পরের দোষচর্চা করে, সেই পরের দোষটা নিমিষেই তার নিজের আপন হয়ে যায়। সাথে সাথে নিজের ইমপ্রুভমেন্টের এরিয়া নষ্ট হয়। নিজের ভুলগুলো তখন আর চোখে পড়ে না। হয়তো তাই মহান মালিক এত কড়াভাবে নিষেধ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

'আর তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে।'[৪০]

হযরত আবু বারযাহ আল-আসলামী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

'হে লোকসকল, যারা (অন্তত) মুখে হলেও ঈমান কবুল করেছ, অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি তোমাদের বলছি, শোনো, তোমরা মুসলমানদের গীবত কোরো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান কোরো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার

৪০. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ১২

দোষ প্রকাশ করেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে চান, তাকে নিজ গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।'[৪১]

মুসতাওরিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করতে করতে এক লোকমা ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে এ জন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনা করতে করতে পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে ওই খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দেবেন।'[৪২]

আরেকটি প্রশ্ন : আপনি যে সমালোচনা করছেন তার উৎপত্তি কুধারণা নয়তো?

কেউ আপনার শাশুড়ি সম্পর্কে জানতে চাইল, আপনি বললেন, মনে হয় আমার শাশুড়ি আসলে আমাকে ভালোবাসে না, ওপর ওপর ভালো আচরণ করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিকই আমার সম্পর্কে কটুকথা বলে।

আবার বউ-মার বেলায় শাশুড়ি বলেন, খেদমত করে, তবে এটা মেকি, অভিনয়; মন থেকে করে না। ভাবখানা এমন, সবাই মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

এই যে নিজের ইচ্ছামতো ধারণা করছি, এই ধারণাকে বলা হয় কুধারণা। সেই ধারণাকে আবার মানুষের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করছি, মনে হচ্ছে সেটা সত্যি। এই কুধারণাকে যখন অন্যের কাছে প্রকাশ করা হয় তখন তা হয়ে যায় অপবাদ।

---

৪১. সুনানু আবি দাউদ, ৪৮৮০। সহীহ লিগায়রিহি।

৪২. সুনানু আবি দাউদ, ৪৮৮১। হাসান লিগায়রিহি।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

'তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ কোরো না। অবশ্যই কান, চোখ ও হৃদয়—এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[৪৩]

অনেকগুলো ভয়াবহ বিষয় আজ আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। না জেনে কথা বলা, অমূলক সন্দেহ করা, আপনজনের কথা বাছবিচার ছাড়াই বিশ্বাস করা ইত্যাদি। এভাবে সমাজে এমন বহু কথা ছড়িয়ে পড়ে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এই ভিত্তিহীন গুজবগুলো ঘরের ভেতরের সম্পর্কগুলো নষ্ট করে। তাই শোনা কথার সত্যতা যাচাই করা জরুরি। ইসলামে খবরের সত্যতা যাচাইয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

'হে মুমিনরা, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্পদের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে যাতে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে না হয়।'[৪৪]

যাচাই না করে কোনো খবর প্রকাশ করা ও বিশ্বাস করা মিথ্যাবাদী হওয়ার নামান্তর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'কোনো ব্যক্তি যা শুনেছে তা-ই (যাচাই করা ছাড়া) বর্ণনা করা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'[৪৫]

---

৪৩. সূরা ইসরা/বনী ইসরাঈল, (১৭) : ৩৬
৪৪. সূরা হুজরাত, (৪৯) : ৬
৪৫. মুসলিম শরীফের ভূমিকা, ১/১০; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৯৯২। সহীহ।

অপর হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

'তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারও দোষ অনুসন্ধান কোরো না, গোয়েন্দাগিরি কোরো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিয়ো না, পরস্পর হিংসা কোরো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ কোরো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ কোরো না; বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে থেকো।'[৪৬]

তা ছাড়া কেউ অপরাধ করলেই তার সমালোচনা করা এ কারণেও উচিত নয় যে, হতে পারে সে ভুল করে তওবা করেছে। অনেক সময় এমন হয়, বউ-মা হয়তো প্রথম জীবনে কোনো অপরাধ করেছে, হয়তো অনুতপ্ত হয়েছে বা তওবাও করে ফেলেছে। আর এদিকে শাশুড়ি সারাজীবন সে অপরাধ নিয়েই তাকে খোঁটা দিতে থাকল। সুযোগ পেলেই পরিচিত মহলে শাশুড়ি-মা সেই কথা দুয়েকবার তোলেন। অন্যদের ভালো শাশুড়ি হওয়ার উপদেশ দেন এভাবে—আমার কথা চিন্তা করেন, আমার ছেলের বউ এই করেছে ওই করেছে, তারপরও এই ছেলের বউকে নিয়েই তো আমি সংসার করছি! এটা বউ-মার প্রশংসা হলো না বদনাম হলো?

শুধু শাশুড়ি-মায়েরা না, আমাদের বউ-মা'রা কি কম যায়? একচুল ভুলি নাই, সব মনে আছে। আমি নরম-সরম ছিলাম, বুঝতাম না কিছু, যা ইচ্ছা তা-ই করেছে মহিলা। বয়স হোক, সব কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দেব।

কী দুঃসাহস!

আর হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত মুয়ায ইবনু জাবাল রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইকে কোনো এমন গোনাহের ওপর লজ্জা দিল, যে গোনাহ

৪৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৩

থেকে সে তওবা করেছে, তবে এই লজ্জাদাতা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ওই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত না হবে।[৪৭]

প্রশ্ন : এবার আপনি যে সমালোচনা করছেন তা অপবাদের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না তো?

কিছু কর্মের কোনো কাফফারা হয় না। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া তেমনই একটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি পাপ এমন, যার কাফফারা নেই। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো কোনো মুমিনকে অপবাদ দেয়া।[৪৮]

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে এমন দোষে দোষারোপ করবে, যা থেকে সে মুক্ত, আল্লাহ তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' নামক জাহান্নামের গর্তে বাসস্থান করে দেবেন, যতক্ষণ সে অপবাদ থেকে ফিরে না আসে।'[৪৯]

তাই কথা বলার সময় সতর্ক না থাকলে বিপদ।

ঘরে-বাইরে, প্রতিবেশীর সাথে আলাপে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, অফিস-আদালতে আমরা কম-বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হই।

তখন আপনি কী করতে পারেন? কী করতে পারেন বলতে অন্য কেউ যদি আপনার সমালোচনা করে, তখন আপনি কী করবেন? আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

সমালোচনার সম্মুখে করণীয়

প্রথমত, নিজের সমালোচনা শোনার পরে সাথে সাথে কিছু একটা বলার জন্য মনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তাৎক্ষণিক

---

৪৭. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫০৫। সনদ খুবই দুর্বল।
৪৮. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৩৭। সনদ হাসান লিগায়রিহি।
৪৯. সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৩৫৯৭। সহীহ।

যুক্তি খোঁজা শুরু হয়, যুক্তিগুলো আওড়ানো শুরু হয়। তাড়াহুড়া করে আওড়ানো এই কথাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অনুশোচনার কারণ হয়। পরে মনে হয়, কেন এভাবে বললাম, এভাবে না বললেও তো হতো। আপনি যখন সমালোচনা সামলাবেন তখন আপনাকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে যে বিষয়ে তা হলো 'তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া'।

এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজের সম্পর্কে খারাপ কথা শুনলে প্রথম অনুধাবনে কষ্ট লাগে। দ্বিতীয়বার অনুধাবনে মনে হয় ঠিক আছে, দেখছি কেন এমন কথা হচ্ছে, এর ভিত্তি কী? তৃতীয়বার অনুধাবনে মনে হয়, থাক, এভাবে বলাটা ঠিক হবে না, আরেকটু চিন্তা করে ওভাবে বলব। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি ন্যূনতম এক সেকেন্ড সময়ও নেন চিন্তা করার জন্য, তবে এই এক সেকেন্ডই আপনাকে তাৎক্ষণিক খারাপ রেসপন্স থেকে দূরে রাখবে। তা ছাড়া আপনার সামনের জনেরও মাথা তখন গরম থাকে, কোনোভাবে ওই সময় যদি একটু চুপ থাকা যায়, তবে আপনার সমালোচকও মাথা ঠান্ডা করার একটা সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্য! সমালোচক কী উদ্দেশ্যে সমালোচনা করছে সেটা সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। ভালো কিছু থাকতে পারে।

নিজের সম্পর্কে কিছু শুনলেই অতশত না ভেবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লাগি। কিন্তু আমরা কেউই নির্ভুল না, আমাদের সবারই কোনো না কোনো সমস্যা আছে, কিছু কিছু ভুল তো হয়ই। যদি খোলা মনে নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখা যায়, বা সমালোচকের কথাগুলো মন দিয়ে শোনা যায়, তবে নিজের সবলতা বা দুর্বলতাগুলো কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়।

যেমন ধরুন, বউ-মা খুব ঘনঘন বাবার বাড়ি যায়, তা না হলে মুখ ভার করে রাখে। এটা নিয়ে বউ-মার ওপর শাশুড়ির রাগ। দেখা গেল শাশুড়ির সরাসরি বলে না, কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু নিয়ে বকাঝকা করে; শাশুড়ির মনোভাবে বোঝা যায়, বউ-মার এই কাজটা শাশুড়ির পছন্দ না! এখন বউ-মা যদি নিরপেক্ষভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে, তবে সে সহজেই শান্তিময় কোনো পথ বের করতে পারে। বাবার বাড়ি যাওয়ার ডিউরেশনটা সে একটু বাড়াতে পারে, এতে খুব একটা ক্ষতি হয় না, ওদিকে শাশুড়ির সাথে মনোমালিন্য কিছুটা কমে। শাশুড়ির সাথে যদি রাগারাগি চলে, তবে বাবার

বাড়িতে গিয়ে আরামে থেকেও কি শান্তি পাওয়া যায়? মনের মধ্যে খচখচ করে না?

তৃতীয়ত, অপরজনের কাছ থেকে আসা সব প্রতিক্রিয়ার মাঝেই আপনি দুই ধরনের বিষয় পাবেন, গঠনমূলক সত্য বা ধ্বংসাত্মক মিথ্যা। আপনাকে নিয়ে সামনেরজন যা বলছে সেটা গঠনমূলক না ধ্বংসাত্মক, সেটা যাচাই করে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর মিথ্যা আজেবাজে বিষয়গুলোকে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হবে।

সব সমালোচনা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না। কিছু সমালোচনা খোঁটা দিয়ে দমিয়ে দেয় আর কিছু সমালোচনা ভুলভাল দিক বা ব্যর্থতাগুলোকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয়। আবেগের মধ্যে সহানুভূতি আর অনুপ্রেরণাকে এক লাইনে রেখে সম্মানের সাথে মন্তব্য করতে সবাই পারে না। তবে আপনি কিছুটা চোখ-কান খোলা রাখলেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কথার ভেতর থেকে গঠনমূলক সত্য বিষয়গুলোকে আলাদা করতে পারবেন। সাথে সাথে তাদেরও চিনতে পারবেন যারা আইনি বিভাগে না পড়েও আপনার জজ-ব্যারিস্টার হয়ে বসে আছেন।

মনে করুন আপনার শাশুড়ি বলল, আমার বউটা একদম আমার ছেলের দিকে খেয়াল করে না, শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে! কিন্তু আপনি জানেন, এটা সত্যি কথা না। আপনি বাস্তবিকই আপনার স্বামীর দেখভাল করেন, যথেষ্ট যত্ন করেন। তাহলে এ ধরনের সমালোচনাকে মন পর্যন্ত যেতে দেয়া তো দূরে থাক, কানেই তুলবেন না। কথা ফিল্টার করার সময় প্রথম ধাপেই বাদ পড়বে এসব আজেবাজে মন্তব্য।

আবার ধরুন আপনার বউ-মা বলল, আমার শাশুড়ি তো ঠিকমতো খেতেও দেয় না। আপনি জানেন এটা ভুল কথা, তবে বউ-মার এই মিথ্যা মন্তব্যে মন খারাপ না; বরং এটা কানেই তোলা যাবে না।

তবে মানুষজনের মন্তব্য থেকে ধারণা পাওয়া যায় কে কেমন। আর এই স্পষ্ট ধারণাকে কাজে লাগিয়েই তাদের সাথে আচরণ করতে হয়। আপনি যখন জানেন একটা মানুষ সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে কথা বলে, তখন আপনি সহজে সচেতন হয়ে যেতে পারেন তার ব্যাপারে।

সমালোচনা শুনে যাচাই করে সত্য বা মিথ্যাকে আলাদা করতে পারলেই বুঝবেন এই সমালোচনা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার লেগে থাকার মনোবল ভাঙতে পারবে না।

চতুর্থত, প্রশ্ন করতে হবে। যদিও এটা অনেকাংশে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। সব সময় প্রশ্ন করে ফিডব্যাককে কনস্ট্রাক্টিভ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি সম্ভব হয় তবে সমালোচকের কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই স্পষ্টভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করুন। আপনার এই প্রশ্নগুলো সমালোচককে চুপ করাতে সাহায্য করবে।

নয়তো মানুষ যখন অন্য মানুষের বদনাম করা শুরু করে তখন অনর্গল কথা মুখ দিয়ে বের হতেই থাকে, কোনো থামাথামি থাকে না। আশেপাশের খুব কম মানুষ আছে, যারা আমাদের খারাপ দিকগুলোকে ভালোতে পরিবর্তন করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করে। অধিকাংশই বদনাম করে মজা নেয়। আপনি যখন প্রশ্ন করবেন তখন এই বদনামের ভেতর থেকেও আপনার জন্য উপকারী ভালো অংশটুকু বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। বিতর্ক এড়িয়ে প্রকৃত সমস্যাগুলোর মূলে যাওয়ার জন্য প্রশ্ন করা একটি চমৎকার উপায়। উদ্ধত না হয়ে বিনয়ের সাথে যথাযথ 'প্রশ্ন' সমালোচনার একটি উত্তম প্রতিক্রিয়া।

যেমন কেউ আপনার সম্পর্কে এটা-সেটা বলছে। আপনি তখন প্রশ্ন করতে পারেন, আচ্ছা এবার তো আমার এই সমস্যা হয়েছে, এবার যদি ভালো করতে চাই তবে কীভাবে করব কাজটা? অথবা দ্বিতীয়বার যখন কাজটা করব আপনি একটু কষ্ট করে চেক করে দেবেন। অথবা ওই পরিস্থিতি কীভাবে আরও ভালো উপায়ে সামলানো যেত? আপনার মতামত কী? অমুক সমস্যার সমাধান কী? আপনার কাছে কী মনে হয়?

ধরুন আপনার শাশুড়ি বলল, অমুকের সাথে মিশবে না। এটা শুনে আপনিও অমুকের সাথে মেশা বন্ধ করে দিলেন বা দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এরপরও শাশুড়ির যখন আপনার ওপর রাগ হয় তখন এই ইস্যুটা তোলেন— 'এর সাথে ওর সাথে মিশে তুমি খারাপ হয়ে গেছ!' তখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, হ্যাঁ, উনাদের সাথে আগে আমি মিশতাম, এখনো কি মেলামেশা করি?

তবে আপনার প্রশ্ন শুনে শাশুড়ি-মা বলতে পারেন, মুখে মুখে তর্ক কোরো না তো! প্রশ্ন শুনে যারা এইভাবে রেসপন্স করে তারা সাধারণত যুক্তি মানে না বা রিজনিং বোঝে না। তাদের কাছে যুক্তি দেখানোর কোনো মানে হয় না।

নিজের সম্পর্কে কোনো কথা শোনার পর গজগজ করে অনেক কথাবার্তা বলার চেয়ে বলিষ্ঠভাবে দু-একটা যথাযথ 'প্রশ্ন' ভালো ইমেজ তৈরি করে। গীবত-শেকায়েত কম হয়। সম্পর্ক ভালো থাকে। সমালোচকরাও বাঁচে, যার সমালোচনা করা হয় সেও বাঁচে।

পঞ্চমত, গঠনমূলক সমালোচনাকে কাজে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যদি কেউ সত্যি সত্যিই আপনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বা আপনার যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কোনো মন্তব্য দেয়, তবে এসব মন্তব্যগুলো থেকে পদক্ষেপ নেয়া আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরের গঠনমূলক সমালোচনা থেকে নিজের কোনো বিতর্কিত বিষয় বদলে ফেলতে চাইলেও যে জিনিসটা আমাদের বাধা দেয়, তা হলো 'ইগো'। অমুকের কথায় আমাকে বদলাব, তাহলে ছোট হয়ে যাব না!

অন্যের কাছে থেকে আসা ফিডব্যাকের মধ্যে অনুসরণীয় কিছু বিষয় থাকে। সত্য সত্যই সমস্যা তো আমাদের আছেই। সামনেরজনের প্রতিক্রিয়ার মাঝে যে বিষয়গুলো বিতর্কিত না, সেগুলোকে ধন্যবাদ দিয়ে মুখে স্বীকার করা উচিত। আপনি এটাকে মনে করতে পারেন শেখার একটি সুযোগ।

যেমন কেউ বলল, আপনি খুব জোরে কথা বলেন। আপনি মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন, আপনি খুব জোরে কথা বলেন না। তবে এর চেয়েও আস্তে কথা বলা যায়। এবং মহিলাদের যেহেতু কণ্ঠেরও পর্দা আছে, তাই আপনি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারেন—আওয়াজটা আরও কিছুটা নিচু করার। তখন আপনি অকপটে স্বীকার করতে পারেন, 'হ্যাঁ, আমি একটু জোরে কথা বলি, তবে চেষ্টা করব এখন থেকে নিচু আওয়াজে কথা বলার ব্যাপারে। আমাকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' যে আপনার সমালোচনা করে সে প্রকারান্তরে ভুল ধরিয়ে দিয়ে আপনার বিশেষ এক উপকার করে।

ধরুন, আপনি কোনো কাজ করলেন। কেউ কোনো ভালো কথা বলল না বা গঠনমূলক কোনো মন্তব্যও করল না। এর বিপরীতে কেউ কেউ খারাপভাবে কোনো মন্তব্য করল। সাধারণভাবে বললে এই ধরনের সমালোচনাও কোনো ফিডব্যাক না পাওয়া থেকে ভালো। সঠিকভাবে ফিডব্যাক দেয়া বা নেয়া একটি সংস্কৃতির মতো। যেকোনো পারিবারিক ব্যবস্থাপনার একটি শৈল্পিক দিক হলো,

পরিবারের সদস্যরা মন খুলে তাদের মনের কথাগুলো একে অপরের সাথে শেয়ার করতে পারে, একে অপরের কাজের সমালোচনা করতে পারে। এই ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় ভাই ভাইয়ের ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, বোন বোনের ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, বাবা-মা সন্তানের ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, সন্তান বাবা-মায়ের ভুল ধরিয়ে দিতে পারে। এই ধরনের পরিবার আস্তে আস্তে নির্ভুলের পথে হাঁটতে থাকে। তাই প্রতিক্রিয়া জানাটা এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ আপনার যেকোনো কাজকে কীভাবে গ্রহণ করছে সেটা জানার একমাত্র উপায় হলো ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া। আপনার যেকোনো অবদানে অন্যরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সেটা জানারও উপায় ফিডব্যাক। অপরের কাছ থেকে ফিডব্যাক না পেলে সঠিকভাবে তার খেদমতও আসলে করা যায় না।

ধরুন, আপনি বউ-মাকে বললেন ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনতে। বউ-মা তার মতো করে চা বানিয়ে আনল। আপনি কিছু বললেন না। কিন্তু চা-টা খেয়ে আপনি খুব একটা তৃপ্তিও পেলেন না। কারণ চিনি একটু বেশি হয়েছে, লিকার একটু কড়া হয়েছে। এখন পরবর্তী সময়েও বউ-মা যখন শাশুড়িকে চা দেবে, চায়ের স্বাদ এরকমই হবে এবং যথারীতি বউ-মার হাতের চা খেয়ে শাশুড়ি তেমন একটা তৃপ্তি পাবেন না।

এ ক্ষেত্রে শাশুড়ি-মা যদি প্রথমবারেই বউ-মাকে ফিডব্যাক দিতেন যে–তার কেমন চা পছন্দ–তবে বউ-মার হাতের চা খেয়ে শাশুড়ি-মা তৃপ্তিও পেতেন, ওদিকে বউ-মারও শাশুড়িকে কিছু খেদমত করা হতো। ফিডব্যাক এভাবে উভয় পক্ষকে উপকৃত করে।

সবাই মিষ্টি ভাষায় মন্তব্য করতে না পারলেও এই মন্তব্যই অন্যজনকে চেনার সুযোগ করে দেয়। মানুষ যেভাবেই সমালোচনা করুক না কেন, ফিডব্যাক পাওয়ার সুবিধাগুলোকে আপনি স্মরণ রাখতে পারেন। এই স্মরণটুকু আপনাকে খারাপ সমালোচনা শুনে দমে যাওয়া থেকে বিরত রাখবে। সাথে সাথে গঠনমূলক সমালোচনাকে কাজে পরিণত করতে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে।

আপনি যখন সমালোচককে ধন্যবাদ দিয়ে তার ফিডব্যাক স্বীকার করে নেবেন এবং মনের মধ্যে এই ফিডব্যাক পাওয়ার ব্যাপারে কৃতজ্ঞ হয়ে লাভগুলো স্মরণে রাখবেন, তখন গঠনমূলক সমালোচনাকে কাজে পরিণত করার মতো যথেষ্ট মানসিক শক্তি আপনার থাকবে।

সাথে সাথে অন্যের সব কথাকে যেচে নিজের গায়ে নিতে যাবেন না। কারণ ভালো সমালোচনা সব সময় কর্মকেন্দ্রিক হয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। সেসব সমালোচিত কর্মগুলো শুধরে নিলেই হলো।

সমালোচনাগুলোতে পদক্ষেপ নিতে আরও একটি সচেতনতার প্রয়োজন, আর তা হলো ক্ষতিকর মানুষজনের সাথে কম মেলামেশা। যাদের সাথে মিশে আপনার কোনো ধরনের লাভ হয় না—ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, তাদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করতে হবে অথবা কমিয়ে দিতে হবে। দেখা গেল, আপনি নতুন করে কোনো একটি বিষয় শুরু করলেন। আর ওই টাইপের কিছু মানুষজন এমনভাবে আপনাকে হেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল যে, আপনার আর কন্টিনিউ করা হলো না।

দুই ধরনের চিন্তাকে সামনে রেখে আলোচনা শুরু হয়েছিল। একটি হলো—সমালোচনার সম্মুখে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আরেকটি হলো—আমরা কীভাবে অন্যের সমালোচনা করব?

এবার আপনার সমালোচনা করার পালা।

কীভাবে অন্যের সমালোচনা করতে হয়?

১. প্রশংসা দিয়ে শুরু করুন

সমালোচনার আগের প্রশংসাটুকু আপনার মন্তব্যকে সামনের জনের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করবে। সে সহজে আপনার কথায় আস্থা রাখতে পারবে। আপনার থেকে সমালোচনা শুনে অন্তত তার এটুকু মনে হবে যে, আপনি তাকে সাহায্য করতে চান। প্রশংসাসমেত সমালোচনা অন্তরে খুব একটা ঘা দেয় না। আমরা যা ভালো করেছি তার জন্য প্রশংসিত হওয়ার পরে দু-একটা খারাপ কথা শোনা তুলনামূলক সহজ। এতে মন ভাঙে না, উপরন্তু সংশোধনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

প্রশংসা দিয়ে সমালোচনা শুরু করে যখন আপনি তিরস্কারের পয়েন্টে যাবেন তখন 'কিন্তু' শব্দ দিয়ে শুরু করবেন না। কিন্তুর পরিবর্তে 'এবং' ব্যবহার করতে

পারেন। কোনো একটা মন্তব্য দেয়ার পরে যদি 'কিন্তু' বলা হয়, তবে আগের মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। যেমন বউ-মা বলল, আমার শাশুড়ি অনেক ভালো, কিন্তু অমুকের সাথে এই সমস্যা ওই সমস্যা তার লেগেই আছে। মাঝখানের এই কিন্তু শব্দটি শাশুড়ির ভালো দিকগুলোকে অনেক নিচে নামিয়ে দেবে।

আবার ধরুন আপনার বউ-মার অনেক ধরনের গুণ আছে। কিন্তু সে পরিপাটি করে ঘর গোছাতে পারে না। 'কিন্তু' শব্দের পরিবর্তে আপনি এভাবে সমালোচনা করতে পারেন, তোমার অন্যান্য সব গুণই আমার অনেক ভালো লাগে এবং ঘর গুছানোটাও যদি শিখে যেতে তবে একদম দশে দশ।

একবার আবু বাকরা সাকাফী (নুফাই ইবনু হারিস) রাযি. মসজিদে এসে দেখেন জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছে, নামাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু তা-ই না, সবাই রুকুতে যাচ্ছে। তখন ওই সাহাবী এক মজার কাজ করলেন। উনি দরজার কাছেই রুকুতে চলে গেলেন এবং এই অবস্থাতেই হেঁটে হেঁটে জামাতের কাতারে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি নামাজ শেষ করলেন।

নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, নামাজের মধ্যে রুকুতে চলাচল করেছে কে? আবু বাকরা রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার (জামাতে নামাজ পড়ার) আগ্রহতে বরকত দান করুন। পরেরবার থেকে এমন কোরো না।[৫০]

প্রথমে সাহাবীর প্রশংসা করে দুআ করেছেন, তারপর তারগীব দিয়েছেন।

মনে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি.-কে সংশোধনে কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আবদুল্লাহ কতই-না ভালো লোক, (আরও ভালো হতো) যদি সে রাতের নামাজ বা তাহাজ্জুদ আদায় করত![৫১]

ভালো গুণগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে দুআ করতে হবে, বাহবা দিতে হবে, তারপর খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো সংশোধনে নামতে হবে।

---

৫০. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২০৪৫৭; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮৩
৫১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২২

২. সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সমালোচনা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কথা কাটাকাটি বাঁধে, তবে স্ত্রী-সমাজের কমন ডায়ালগ হলো, আমি বলে তোমার সাথে সংসার করে গেলাম, অন্য কেউ হলে একমুহূর্ত থাকতে পারত না। কোনোদিন আমার জন্য কিছু করেছ? ঝগড়া হলে সারাজীবনের সমস্ত অবদান নিমেষেই শেষ।

যেকোনো ব্যক্তি একটি বিষয়ে ভুল করলে তার সব বিষয়কে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করা আমাদের নারীসমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কী সমস্যা হয়েছে, কোথায় সংশোধন করতে হবে সেটা পরিষ্কার করে না বলে সামনে-পেছনে অনেক কথা বলে যাওয়া হয়। বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে 'ঘ্যানর ঘ্যানর'। আবার অনেকে এভাবে বলেন, তুমি যা করছ তা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ভুল ঠিক কোন জায়গাটায় হয়েছে সেটা পরিষ্কার বলেন না। শুধু বলেন, বুঝবা, একদিন বুঝবা, কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না। অনেকে আবার বলেন, তুমি যা করেছ সবই ভুল। নির্দিষ্ট ইঙ্গিত না দিয়ে অনেকেই ঢালাওভাবে সবকিছুকে খারাপ বলেন।

বাস্তবতা হলো, আপনার মন্তব্য যত অস্পষ্ট হবে তত গুরুত্ব হারাবে। তখন আপনি বলবেন, আমি এত বলি কিন্তু কারও কানে আমার কথা ঢোকে না, কেউ আমার কথা শোনে না।

৩. হুকুম নয় প্রশ্ন করুন, পরামর্শ দিন

হুকুম তামিল করতে করতে হুকুম পালনকারীরা একসময় বিদ্রোহী হয়ে যায়। আন্তরিকভাবে আর হুকুম মানতে চায় না। চাপিয়ে দেয়া মানসিকতার মানুষজন সাধারণত হুকুম করেই কাজ আদায় করে।

তাই হুকুম করা বা আদেশ দেয়ার পরিবর্তে প্রশ্ন করুন। সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করা যায়, যা শেষ পর্যন্ত আরও ভালো সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন, তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দিন। যদি তাদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুলও হয়, এই ভুল তাদের শিখতে সাহায্য করবে।

তাই সরাসরি এটা করো, ওটা করো; এটা কোরো না, ওটা কোরো না, তোমাকে

কাজটা এভাবেই করতে হবে ইত্যাদি বলার চেয়ে বলতে পারেন, তুমি কি মনে করো কাজটা করা সম্ভব হবে? কাজটা কীভাবে করলে ভালো হয়?

আমরা যখন উদ্ধত হয়ে কোনো হুকুম করি তখন এটা আমাদের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি যখন চরমে ওঠে তখন ব্যাপারটা ভালো। কিন্তু পরিস্থিতি তুলনামূলক ভালো আছে, তবে অবশ্যই নরম ভাষায় পরামর্শ দেয়া আদেশের চেয়ে বেশি উপকারী। আপনি এভাবে পরামর্শ দিতে পারেন, তুমি যদি এটা অন্য উপায়ে করো তবে ফলাফল আরও ভালো হবে।

প্রশ্ন করে মতামত জেনে পরামর্শ দেয়া বা সাজেশন দেয়া আরও একটি উপকার করে। এভাবে সমালোচনা করলে দুজনের কথোপকথনই গুরুত্ব পায়। তখন সমালোচকের কথায় একতরফা আঘাত লাগে না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যেকোনো সমালোচনাকে সহজতর করে তোলে।

৪. ব্যক্তি নয়, কর্মের সমালোচনা করুন

এমন মানুষ হয়তো পাওয়া যাবে না যে ছোটবেলায় 'পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা করো' এই ভাব-সম্প্রসারণ লেখেনি। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টরূপে ঘৃণ্য বলে প্রমাণিত না হলে সাধারণ গুনাহগার বা ভুলত্রুটির শিকার ব্যক্তির ব্যাপারে এই বাক্যটি প্রয়োগে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না।

প্রথমত যত রাগ-আক্রোশ-ঘৃণা সব হওয়া উচিত খারাপ কাজকর্মের জন্য, মানুষের ব্যক্তিসত্তার জন্য না। বিচারপতি তাকী উসমানী সাহেব হাফি. তার ইসলাহী মাজালিস কিতাবে লিখেছেন, কুফরকে ঘৃণা করো কাফেরের মানবসত্তাকে নয়। পাপীকে মনে করো সে একজন রোগী। কারও যখন কোনো রোগ হয় তখন কি মানুষ রোগীকে ঘৃণা করে? কেউ যদি কোনো খারাপ কাজে বা গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার কাজকে ঘৃণা করো, তাকে ঘৃণা কোরো না; বরং তার ওপর করুণা করো।[৫২]

আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বা গুনাহ করে তার ওপর তুমি রাগ করতে পারো, অসন্তুষ্ট হতে পারো। এটা জায়েয। তবে কখনো তাকে নিজের চেয়ে খারাপ মনে করবে না। কাউকে শাস্তি দেয়ার

৫২. ইসলাহী মাজালিস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩

দায়িত্ব যদি তোমাকে দেয়া হয়, তবে সাবধান, কখনো নিজেকে তার চেয়ে উত্তম মনে করবে না। কারণ হতে পারে সে গুনাহগার আল্লাহর কাছে রাজপুত্রের মর্যাদা রাখে আর তুমি চাকর-জল্লাদের মর্যাদা রাখো। এটা খুব স্বাভাবিক বিষয়, রাজা জল্লাদের হাতে রাজপুত্রের শাস্তি দিলেও জল্লাদ কখনো রাজপুত্রের চেয়ে মর্যাদাবান হতে পারে না।[৫৩]

বউ-মা, শাশুড়ি একে অন্যের প্রতি কোনো কারণে রাগ আসতে পারে, অসন্তুষ্ট হতে পারে, তবে পারস্পরিক সমালোচনায় যেন একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অটুট থাকে। এ ক্ষেত্রে কর্মের সমালোচনা খুবই সহায়ক।

ধরুন কোনো বউ-মা শাশুড়ি সম্পর্কে বলল, 'আমার শাশুড়ি মোটেও মিশুক না।' এটাকে বলা হয় ব্যক্তির সমালোচনা। ব্যক্তির সমালোচনায় নামের সাথে সরাসরি কোনো বিশেষণ যোগ করে দেয়া হয়। কর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রে বউ-মা এভাবে বলতে পারত, 'আমার শাশুড়ি কথা একটু কম বলেন, মানুষের সাথে খুব একটা মেলামেশা করেন না।'

আবার ধরুন শাশুড়ি ছেলের বউকে বললেন, 'তুমি খুবই অলস।' এটা হলো ব্যক্তির সমালোচনা। কর্মের সমালোচনা হলে কেমন হতো? বউ-মা যেসব কাজে অলসতা দেখাচ্ছে সেইসব কাজগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হলো কর্মের সমালোচনা। যেমন : 'বাহির থেকে এসে কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র না গুছিয়ে একই জায়গায় ফেলে রাখে; জায়গার জিনিস জায়গায় গুছিয়ে রাখতে তার কয়েক দিন পর্যন্ত সময় লাগে।'

৫. সমালোচনায় সহমর্মিতা

আচ্ছা, আপনাকে যদি বলা হয়, অন্যের কাছ থেকে কেমন ধরনের সমালোচনা পেলে আপনি অনুপ্রাণিত হন? মন ভেঙে যাওয়ার পরিবর্তে উৎসাহিত হন? তখন উত্তর অনেকটা এমন হবে, কেউ যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভুল ধরিয়ে দিত, তাহলে ভালো হতো।

আপনি যেমন চান, আপনার সমালোচক আপনার পরিস্থিতিগুলো বুঝে আপনার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে মন্তব্য করুক, তেমনই আপনি যার

৫৩. ইসলাহী মাজালিস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫২

সমালোচনা করছেন তিনিও এমনই চান। তিনিও তার সমালোচনায় আপনার সহমর্মিতা দেখতে চান।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমার জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।'[৫৪]

নিজের জন্য যে ধরনের সমালোচনা শুনতে পছন্দ করেন, অপরজনের জন্য সে ধরনের সমালোচনা করা কর্তব্য।

'সহমর্মী হয়ে সমালোচনা' মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার একটি সুন্দর উপায়।

সত্যি বলতে কি, কেউ যখন অন্যের মুখ থেকে তাঁর কোনো দোষের কথা শোনে, সে কিছু সময়ের জন্য হলেও একটি কষ্টকর মুহূর্ত পার করে। অবস্থাটা কিছুটা বিব্রতকর। এই বিব্রতকর অবস্থাটাকে সহসাই স্বাভাবিক করে তোলে আপনার সহজ-সাবলীল দরদমাখা মন্তব্য।

৬. নিজের সমালোচনা দিয়ে শুরু করুন

সাধারণত কী হয়? যখন আমরা সমালোচনা করি তখন আমাদের মনোভাব বা উপস্থাপন এমন থাকে—যে জীবনে আমাদের কোনো ভুল হয়নি, ভুল হতেও পারে না, আমরা অনেক কিছু জানি, জীবনে অনেক সফল। কিন্তু আসলে সবার জীবনেই অনেক ভুল আছে, ভুল সিদ্ধান্ত আছে, ব্যর্থতা আছে।

আপনি যখন অকপটে আপনার লাইফে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ভুল ও ভুল সংশোধনের উপায়গুলো নিয়ে কথা বলবেন, তখন আপনি ও আপনি যার সমালোচনা করছেন উভয়ের মাঝে একটু বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে। সে ভুলের একজন সঙ্গী পাবে। এই ভুল থেকে বের হয়ে আসতে আপনি কী কী

৫৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫

উপায় অবলম্বন করেছিলেন সেগুলো যখন তার কানে যাবে, তখন সে সহসাই ভুল থেকে সরে আসতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এটা শুধুই আপনার জীবনের গল্প বলে শোনানো না; বরং ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটি পরামর্শ।

ধরুন, বউ-মা তেমন একটা রান্না করতে পারে না বা রান্না করলেও খাবারের স্বাদটা খুব একটা ভালো হচ্ছে না। শাশুড়ি-মা চাচ্ছেন বউ-মা রান্নার ব্যাপারে আরেকটু যত্নবান হোক। এ প্রসঙ্গে বউ-মার সমালোচনা করার আগে শাশুড়ি এভাবে বলতে পারেন, তোমার এই সময়ে আমিও ভালো রান্না পারতাম না, না পারাটা ব্যাপার না, চেষ্টা করতে থাকলে একসময় সব হয়ে যাবে। এতে শাশুড়ির প্রতি বউ-মার আস্থা বেড়ে যাবে, তখন শাশুড়ির উপদেশকে কাজে পরিণত করা বউ-মার জন্য তুলনামূলক সহজ হবে।

৩. সম্পর্কের আশা-প্রত্যাশা

পরের কাছে আমরা যা আশা করি তা প্রত্যাশা। প্রত্যাশা যত বেশি হবে কষ্ট পাবার আশঙ্কাও তত বেশি। প্রত্যাশা কম, কষ্টও কম। কথায় আছে, 'প্রত্যাশাহীন জীবন স্বর্গের মতন'। এর মানে কি একেবারেই প্রত্যাশা করা উচিত নয়?

আমাদের সম্পর্কগুলো সব সময়ই প্রত্যাশার চাদরে মোড়া থাকে। দুনিয়াতে সম্পর্কগুলো সফলভাবে বছরের পর বছর টিকে থাকার পেছনে বড় একটি কারণ প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার কারণেই স্বামী-স্ত্রীর, শ্বশুর-শাশুড়ি, বউ-মা-জামাই, ননদ-ভাবি, ভাই-বোন সবার মধ্যে পারস্পরিক অধীনতা তৈরি হয়। শুধু পরিবারের ভেতরেই না, পরিবারের বাইরেও একধরনের পারস্পরিক নির্ভরতা তৈরি হয়। আমরা পরিষ্কার থাকতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ওপর নির্ভর করি, ঘরের কাজে সাহায্য নেয়ার জন্য কাজের মানুষের ওপর নির্ভর করি। আমরা চাইলেও খুব একটা স্বাধীন হতে পারি না। ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে ভালোভাবে বাঁচা যায় না, ভালোভাবে বাঁচতে ইন্টারডিপেন্ডেন্সি লাগে। তখন আমরা একধরনের প্রত্যাশার জালে আটকে যাই।

আবার ধরুন আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে প্রত্যাশা করতে পারি—উনি হালাল রিযিকের জন্য চেষ্টা-মেহনত করবেন। কারণ এটা উনার দায়িত্ব। আবার আমার হাজব্যান্ড আমার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন, আমি দায়িত্বশীলতা ও মিতব্যায়িতার সাথে ঘরকন্না করব, বাচ্চাদের দেখভাল করব। কারণ, এটা

আমার দায়িত্ব। যার যে দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বের জায়গাটুকুকে তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতেই পারে।

যেটুকু দায়িত্ব না, কিন্তু দয়া, অনুগ্রহ ও উপকারী বিষয়ের মধ্যে পড়ে, সেটাও প্রত্যাশা করা যেতে পারে। যেমন : শাশুড়ি তার বউ-মার কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, কিছু খেদমত প্রত্যাশা করতেই পারেন। বউ-মাও শাশুড়ির কাছ থেকে আদর-স্নেহ প্রত্যাশা করতেই পারেন।

ভালো ধারণাকে সামনে রেখেই আমরা প্রত্যাশা শুরু করি। কিন্তু অসচেতনতার কারণেই হোক, আর নার্সিং না করার কারণেই হোক, কখন যে 'প্রত্যাশা' হ্যাপিনেস-কিলার হয়ে ওঠে, নিজেরাও টের পাই না। বুঝে উঠতে পারি না, কোন ফাঁকে প্রত্যাশাগুলো এত মোটাসোটা হয়ে গেছে। এই মোটাসোটা প্রত্যাশার কাছে বারবার পরাজিত হতে থাকে আপনার আত্মসম্মানবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি।

সুখের সম্পর্কগুলোকে নিমেষেই অসহনীয় করে দিতে পারে এই লাগামছাড়া প্রত্যাশা। এ শুধু আপনার অনুভূতিতে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হবে না। আপনি দুনিয়ায় যে শান্তি পেতে চান সেই শান্তির গলায় সব সময় কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে। সম্পর্ককে খারাপ করার জন্য এই একটা জিনিসই যথেষ্ট—এলোপাতাড়ি চাওয়া, অশেষ প্রত্যাশা।

বেসামাল প্রত্যাশার একটা উদাহরণ দিই।

ধরুন, আপনি বাবার বাড়িতে খুব স্বাধীনচেতা হয়ে বড় হয়েছেন। কোনো কাজে বিশেষ বাধা-নিষেধ নেই। সেখানে কারও ব্যক্তিগত কাজে তেমন কেউ হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু বিয়ের পরে দেখলেন শ্বশুরবাড়িতে অতটা স্বাধীনতা নেই, শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে একজন খুবই কড়া। সব বিষয় মোটামুটি উনাদের নখদর্পণে। এখন এই রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে এসে যদি বাবার বাড়ির মতো ফ্রিডম প্রত্যাশা করেন, তখন আপনার এই প্রত্যাশাগুলো হয়ে যাবে বেসামাল প্রত্যাশা। পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনি যদি প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তবে নিঃসন্দেহে এই 'বিষময় প্রত্যাশার' অন্যায় আকুতি আপনাকে বেসামাল করে দেবে।

আবার অনেক ছেলের মায়েরা আছেন যারা ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে বিভিন্ন

উপহার-উপঢৌকন প্রত্যাশা করে থাকেন। উনারা এটাকে যৌতুক বলেন না, বলেন 'উপহার'। 'আমাদের কোনো ডিমান্ড নেই, কিন্তু মেয়েকে খুশি হয়েও তো কিছু দেয়া যায়!' এগুলো এলোপাতাড়ি প্রত্যাশা। এসব প্রত্যাশা যখন পূরণ হয় না তখন আস্তে আস্তে মনোমালিন্য শুরু হয়, শুরু হয় সম্পর্কে টানাপড়েন।

আমাদের প্রত্যাশা বা চাওয়াগুলো এলোপাতাড়ি হওয়ার পেছনে শুধু আমাদের লোভ বা প্রবৃত্তি দায়ী না। অনেকাংশে আমরা জানি না প্রত্যাশাগুলো কেমন হওয়া উচিত। অনেক সময় সমাজের স্রোতে ভেসে যাই। আর দশজন যেভাবে চায় আমরাও সেভাবেই চাইতে থাকি। আলাদা করে ভাবার সময় হয় না—সামনের জনের কাছ থেকে আমি আসলে কী চাই বা চাওয়াগুলো কেমন হতে পারে? অনিশ্চয়তা বা একা হয়ে যাবার ভয়ে সমাজের গতানুগতিক বিতর্কিত ভালো-মন্দ সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই আপন করে নেয়া হয়। যেমন : বউ-মার প্রতি শাশুড়ি-মা বা শাশুড়ি-মায়ের প্রতি বউ-মার প্রচলিত প্রত্যাশাগুলো উনারা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করেন। অনেক প্রচলন আছে যেগুলো সব সময় শাশুড়ি বা বউ-মার ব্যক্তিত্বের সাথে মিলে যায় না। তখনই খটকা বাঁধে। যেমন সমাজে প্রচলিত আছে, বউ-মা আসার পর শ্বশুরবাড়ির মোটামুটি সব কাজকর্ম সে করবে। নতুন বউ, সব কাজ ঠিকঠাক নাও করতে পারে। তখন একটা খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়—ও, বাপ-মা কিছুই শেখায়নি!

ঘরে প্রত্যাশার আবেগ থাকবেই। এটাকে সমূলে নির্মূল করা যায় না। শুধু আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, কোন কোন প্রত্যাশাগুলো আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলছে বা মন খারাপের মূলে আছে। খুব একটা মানানসই না বা মনে গোলযোগ সৃষ্টি করে সেসব প্রত্যাশাগুলো আগে চিনে আলাদা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে একেকজনের ভারসাম্যহীন প্রত্যাশা একেক রকম হতে পারে। সঠিক প্রত্যাশা চেনার সহজ উপায় হলো, শুধু দায়িত্বটুকু প্রত্যাশা করা, এর অতিরিক্ত নয়।

লাগামহীন আশা-প্রত্যাশার স্বরূপ

প্রথমত : মহব্বত হোক, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছুই করা লাগবে না

নতুন বিয়ের পর বউ-মা যখন বাবার বাড়ির মানুষজনের কাছে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে এ সমস্যা সে সমস্যা নিয়ে কথা বলে, তখন বাবার বাড়ির মানুষজন

এভাবে সান্ত্বনা দেন—সবে বিয়ে হয়েছে, যখন মহব্বত হয়ে যাবে তখন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এ কথা শোনার পর বউ-মার মনে হয়, ঠিক আছে, তাহলে এই সম্পর্ককে সুস্থ, সুখময় রাখার জন্য আর কোনো প্রচেষ্টার দরকার নেই। আপনি-আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে। সময়ের ব্যবধান মাত্র। আসলেই কি আপনা-আপনি ঠিক হয়? নাকি সচেতন প্রচেষ্টা লাগে? নাকি অপছন্দনীয় বিষয়গুলো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়?

ঠিক এমনটি শাশুড়ি-মায়ের ক্ষেত্রেও ঘটে।

আবার ধরুন বউ-মা ও শাশুড়ি একে অপরকে সত্যিকার অর্থে মহব্বত করে। তার মানে কি এই, তাদের কোনো সমস্যা বা মনোমালিন্য হবে না। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমার ঝুলি রূপকথার গল্পে 'অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করা শুরু করল' শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেলেও বাস্তবে তা ঘটে না। এটা স্পষ্টত অবাস্তব।

আপনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কিছু কিছু সমস্যা আপনার সাথে জোঁকের মতো লেগে থাকবে। একটা সমস্যা শেষ হবে, তারপর আরেকটা সমস্যা শুরু হবে।

তাই 'যখন মহব্বত হয়ে যাবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে' সম্পর্ক ঠিক করার পেছনে যত্নবান না হয়ে এই ধরনের নীতি অনুসরণ করলে সেটাকেই বলে ভুল প্রত্যাশার পেছনে ছোটা। এ ধরনের প্রত্যাশা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয়ত : 'বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয়' তা তো তার জানা উচিত

এত পড়াশোনা করেছ আর শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর, ননদ নিয়ে কীভাবে থাকতে হয় তা জানো না!

এত ধর্ম মানো আর জানো না কীভাবে সংসারধর্ম করতে হয়!

এটা-সেটা সেলাই করতে পারো আর ঘর গোছাতে পারো না!

এত নামাজ-কালাম পড়ে আর ছেলের বউয়ের সাথে একটু ভালো আচরণ করতে পারে না!

একটা কাজে ভালো বলেই যে আরেকটা কাজেও সে দক্ষ হয়ে যাবে—কী মানে আছে?

অনেকে ধরেই নেয় যে, সে কেন জানবে না? কেন বুঝবে না? এটা না বোঝারই-বা কী আছে আর না জানারই-বা কী আছে? মনে হয় যেন, আরও একটা জন্ম সে শাশুড়ি-মা বা বউ-মা হিসেবে পার করে এসেছে!

সংসারে আসার পর শত শত নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এক এক পরিস্থিতি সামলানোর জন্য একেক রকমের যোগ্যতা লাগে। এই ধরনের যোগ্যতা যে সব শাশুড়ি-মায়ের থাকবে অথবা সব বউ-মার থাকবে, সেটা প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক না?

তৃতীয়ত : তার তো আমার পাশে থাকা উচিত, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন!

আমি যা-ই করি না কেন, আমার ছেলে-মেয়ে, স্বামী বা স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, বউ-মা, জামাই পরিবারের সবাই আমার পক্ষেই থাকবে। কারণ আমি তাদের পরিবারের একজন। নিঃসন্দেহে আমি তাদের কাছে মহব্বতের দাবিদার।

কিন্তু আমার কোনো বিতর্কিত আচরণে আমার কাছের মানুষটাও আমার ওপর প্রশ্ন তুলতেই পারে। ভুল ধরিয়ে দেয়া মানেই তো ভালোবাসা কমে যাওয়া না।

ধরুন, বউ-মা সত্যি সত্যি কোনো ভুল করলেন। শ্বশুরবাড়ির মানুষজন ভুলটা ধরিয়ে দিল। শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যদের সাথে স্বামীও ভুলটা নিয়ে কথা বলল। তখন অনেক বউ-মা মনে করেন, আমার স্বামী কেন আমার পক্ষে থাকল না! কেন অন্যদের হয়ে কথা বলল? ব্যস, শুরু হয়ে গেল স্নায়ুযুদ্ধ।

আবার ধরুন, বউ-মার সাথে শাশুড়ির কথা কাটাকাটি চলছে। শাশুড়ি চাচ্ছেন উনার স্বামী, ছেলে-মেয়েরাও তার হয়ে কিছু বলুক। কারণ তিনি এতদিন ধরে পরিবারের সবার সেবা-শুশ্রূষা করে এসেছেন, এখন কেন পরের বাড়ির মেয়ের পক্ষ নেবে?

এটা প্রত্যাশার একটা ভুল দিক। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামতের অধিকারী। এমন অনেক সময় আসবে, যখন একই পরিবারের মানুষগুলো একসাথে একই লাইনে দাঁড়াবে না। কে কার পাশে থাকছে এটা বড় কথা না। কথা হলো, কে অন্যায়কে ছুড়ে ফেলে ন্যায়কে আঁকড়ে ধরেছে।

চতুর্থত : সম্পর্কে আন্তরিকতা যদি থাকে, তবে অন্তরের কথা কেন বুঝবে না

রূপকথার গল্পে বা নাটক-সিনেমায় এই ধরনের অনেক মাইন্ডরিডার থাকে। কিন্তু বাস্তবে 'মাইন্ডরিডার'রা কোথায় আছে কে জানে!

আমি কী বলতে চাই সবাই সেটা দেবদূতের মতো বুঝে যাবে! যাই হোক না কেন আমার সাথে একমত হবে! আমি যেভাবে স্বপ্ন দেখতে চাই সেও ঠিক সেভাবেই স্বপ্ন দেখবে। আমি যেভাবে বলছি সামনের জন্য সেভাবেই বুঝবে। যেন সবাই 'সু মন্তর সু' বলে জাদু করে মনের ভেতরে ঢুকে গেছে!

আমি এভাবে চিন্তা করি বলেই যে, আরেকজনও এভাবেই চিন্তা করবে তার কী মানে আছে? সবাই স্বতন্ত্র, আলাদা আলাদা মানুষ। সবার সবলতা, দুর্বলতা ভিন্ন।

অনেকে প্রশ্ন করে, সে যদি আমার অন্তরের কথা নাই বোঝে, তাহলে সম্পর্কের আন্তরিকতা কোথায় থাকল? এই প্রশ্ন থেকেই হাজার অভিযোগের সূত্রপাত ঘটে। ও কেন এমন করল? কীভাবে করতে পারল?

নিজেকে নিয়ে যতটা না চিন্তা হয় অন্যকে নিয়ে একটু বেশি চিন্তা শুরু হয়!

এটা একটা ভুল প্রত্যাশা।

পঞ্চমত : সামনের জনের কাছ থেকে সব ব্যাপারে পারফেকশন আশা করা

অনেকটা এমন যে, আমার কাজকর্ম, কথাবার্তা যেমনই হোক না কেন, তোমার কাজকর্ম কথাবার্তা সব সময় অলি-আল্লাহর মতো হতে হবে! সেখানে কোনো ধরনের ভুল থাকা যাবে না।

আমি কী বলে বকাঝকা দিলাম বা খোঁচা দিলাম সেটা ব্যাপার না, ব্যাপার হলো তোমার প্রতিক্রিয়া কতটা পারফেক্ট হচ্ছে সেটা।

ধরুন, বউ-মা শাশুড়ির কোনো দেখভাল করে না। কিন্তু শাশুড়ির কাছ থেকে সব সময় ভালো ব্যবহার আশা করে। আবার শাশুড়ি দেখা গেল বউ-মার সাথে কখনো আদর করে কথা বলে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু সব সময় বউ-মার হাসিমাখা মুখ দেখতে চায়। কারণ বউ মানুষ মুখ গোমড়া করে থাকা ঠিক না। তবে শাশুড়ি-মা শক্ত মুখে কথা বললেও তাতে সমস্যা নেই!

আমি নিজের পারফেকশনের ব্যাপারে খুবই উদাসীন, কিন্তু অন্যের পারফেকশনের

ব্যাপারে খুবই সচেতন—এটা কেমন কথা?

ষষ্ঠত : জীবনে এত রকমের সমস্যা কেন হবে? এর গতি কেন সব সময় স্বাভাবিক হয় না? এ বিপদ সে বিপদ সব আমার ঘাড়েই কেন?

অনেকে এভাবে চিন্তাভাবনা করেন, জীবন সুন্দর করার জন্য অনেক চেষ্টা-মেহনত করেছি। তারপরও এত ঝামেলা কেন পোহাতে হয়?

অনেকে আফসোস করে বলেন, কাউকে আর পরিবর্তন করতে পারলাম না, সবাই আগের মতোই রয়ে গেল!

অমুক এটা পেল তাহলে আমি কেন পেলাম না। ওই ভাবির শাশুড়ি এত ভালো, বড় ভাইয়ের বউ-মা এত ভালো, তবে আমার ক্ষেত্রেই এমন কেন হয়?

অমুকের ছেলের বউ কত কেয়ারিং আর আমাদেরটা?

আমার ভাগ্যেই কেন এমন হলো?

নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া যেকোনো অপছন্দনীয় বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাবড়ে যাওয়া, যা পাওয়া যায়নি সেটা না পাওয়ার কারণে মুষড়ে পড়া প্রত্যাশার একটি ভুল দিক।

আপনি সারাজীবন সমস্ত ভালো আচরণ করে এসেছেন বলে যে আপনার সাথে খারাপ কোনো বিষয় ঘটবে না, এর কী নিশ্চয়তা আছে?

অন্যের সাথে তুলনা করে বা নিজের ভালো আচরণের সাথে তুলনা করে প্রাপ্তিকে যাচাই করাও প্রত্যাশার একটি ভুল দিক।

লাগামহীন প্রত্যাশাকে সামলানো

আপনি যখন প্রত্যাশাগুলোকে ঠিকঠাক পরিচালনা করতে পারবেন তখন আপনা-আপনিই হতাশা কমে যাবে। হুটহাট মন খারাপ হবে না। লাগামহীন প্রত্যাশাগুলোকে কীভাবে সামলে রাখা যায় সে সম্পর্কেই কিছু কথা এখানে থাকবে। যেমন :

- আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কিছু চাই বা আশা করি। সব সময় যে খুব হিসাব-নিকাশ করেই চাই এমনটা হয় না।

প্রত্যাশার খারাপ দিকগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, অবাস্তব ও বাস্তবসম্মত প্রত্যাশাগুলো আলাদা করা। অর্থাৎ আপনার সাথে কোন ধরনের প্রত্যাশা খাপ খায় আর কোনটা যায় না, কোনটা বাস্তবসম্মত, কোনটা অবাস্তব সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আবার আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনোটা যদি সামঞ্জস্যহীন হয়, তবে সেটাকে কীভাবে বাস্তবসম্মত আকাঙ্ক্ষায় স্থানান্তরিত করা যায় সে বিষয়েও চেষ্টা থাকা চাই।

যেমন ধরুন, মনে কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগল, তখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, কেন আমি এভাবে প্রত্যাশা করছি? এটা আমার জন্য কতটুকু উপকারী? যার কাছে প্রত্যাশা করছি তার জন্য এটা কতটা সম্ভব?

অনেক শাশুড়ি আছেন বউ-মার কাছে প্রত্যাশা করেন, বউ-মা তার অতীতের সমস্ত ভুল সংশোধন করবে। কেন পারবে না, চেষ্টা করলে তো সব পারা যায়।

এখন বউ-মার জন্য একবারে সব ভুল সংশোধন করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই শাশুড়ি যদি সময় নিয়ে অল্প অল্প করে প্রত্যাশা করেন, তাহলে ওনাকে তুলনামূলক কম হতাশার কষ্ট পেতে হবে। এটাই বাস্তবসম্মত প্রত্যাশার একটা লাভ। মানসিক স্থিরতা দেয়, সাথে সাথে শান্তিও পাওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে আপনি আরেকটি কাজ করতে পারেন। আর তা হলো, আপনি নিজে আপনার বউ-মার কাছে বা আপনার শাশুড়ির কাছ থেকে কী কী বিষয় প্রত্যাশা করেন, সেগুলোর একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরি করতে পারেন। এর মধ্যে যেগুলো আপনার সাথে খাপ খায় সেগুলোতে টিক দিলেন, যেগুলো খাপ খায় না সেগুলোতে ক্রস দিলেন। এভাবে আপনি আপনার প্রত্যাশাগুলোকে সীমানা ঘেরা এক প্রাচীরে আটকে দিলেন। এবার আপনি জানেন কী চাওয়া উচিত আর কী চাওয়া উচিত না।

- আমরা চাই বা আমাদের পেতে ইচ্ছা করে, কারণ আমাদের কিছু শূন্যতা আছে, কিছু অপূর্ণতা আছে, কিছু অপ্রাপ্তি আছে। যা পাইনি আগে তা পেতে চাই।

সব সময় কেউ যদি মনে করে আমি এটা পাইনি, সেটা পাইনি, তাহলে না-পাওয়ার দুঃখে সব সময়ই মনের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকবে।

মজার ব্যাপার হলো, হিসাব করলে দেখতে পাব, যা এখনো পাওয়া হয়নি তারচেয়ে যা পেয়েছি তা অনেক বেশি।

প্রাপ্তিগুলো নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা করা হয় তখন অন্তরে শুকরিয়া আসে। প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণের বড় একটা উপায় শুকরিয়া করা। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক ঠিক প্রশংসা করতে পারলে চাহিদার ক্ষেত্র থেকে সহজেই কৃতজ্ঞতার রাজ্যে প্রবেশ করা যেত।

আপনার শাশুড়ির যে ভালো বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে যদি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেন বা উনার প্রশংসা করেন, তাহলে উনার যেমন ভালো লাগবে, তেমনই তিনি প্রশংসনীয় বিষয়গুলো আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। অপরজনের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ছাড়াই কাঙ্ক্ষিত গুণগুলো বাড়তে থাকবে। বউ-মার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। বউ-মার ভালো বিষয়গুলো নিয়ে যদি শাশুড়ি বউ-মার প্রশংসা করেন, বাহবা দেন, উৎসাহ দেন, তবে ভালো গুণগুলো বউ-মা আরও বেশি আঁকড়ে ধরতে চাইবে।

হয়তো আপনি আপত্তি করতে পারেন, ওর মধ্যে কোনো ভালো গুণই নেই! কিসের প্রশংসা করব?

এমন মনে হলে, আপনার উচিত হবে আরেকবার নজর করে দেখা। আপনি কিছু-না-কিছু গুণ পাবেনই।

- আমাদের নিজেদের ক্যারিয়ার, ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার পেছনে ছোটাছুটি, ভবিষ্যতের সঞ্চয়, গাড়ি-বাড়ির চিন্তা, সামাজিক স্ট্যাটাস বজায় রাখা ইত্যাদিতে আমরা এতটাই ব্যস্ত যে, পরিবারের সবাই একসাথে গল্প করতে করতে চা-নাস্তা খাওয়া, বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে চাওয়া বা ভোরে উঠে ছাদে হাওয়া-খাওয়া, এসব আর হয়ে ওঠে না।

কিন্তু ছোট ছোট এই কাজগুলো আমাদের ভীষণ ভালো রাখে। একসাথে করা এ কাজগুলো যে শুধু বিনোদনমুখরিত হতে হবে তা না। যেকোনো ভারী কাজও হতে পারে। যেমন সবাই মিলে ঘরবাড়ি আসবাবপত্র Deep clean এর মতো কোনো কাজ হতে পারে। একসাথে আনন্দঘন যেকোনো কিছু। কখনো বসে যদি আপনি স্মৃতি হাতরান তবে এ ধরনের কাজের স্মৃতিগুলো খুব চকচকে দেখতে পাবেন।

আমাদের আকাঙ্ক্ষায় তখন হাহাকার ওঠে যখন স্মৃতির পাতায় এসব চকচকে বিষয়গুলো মলিন হয়ে যায়। যেকোনো ধরনের মধুরস্মৃতি সম্পর্কে সন্তুষ্টি জায়গা তৈরি করে, সে যে সম্পর্কই হোক না কেন। আনন্দঘন কিছু কাজ যেন আপনার স্মৃতির পাতায় থাকে, যা আপনার কৃতজ্ঞতার খোরাক জোগায়। যেমন ধরুন বউ-মা ও শাশুড়ি-মায়ের একসাথে শীতকালের পিঠা বানানো, চাঁদরাতে মজার মজার রান্না করা, ঈদের দিন বিকেলে ঘুরতে যাওয়া, বাগানে গাছের পরিচর্যা করা ইত্যাদি যেকোনো ধরনের কাজের স্মৃতি লাগামহীন প্রত্যাশাকে সংকুচিত করে।

- ভুল প্রত্যাশায় বলা হয়েছে, আমরা মাঝে মাঝে তুলনা করেই আমাদের প্রত্যাশাকে ফিক্স করে ফেলি। অমুকের বউ-মা এমন, তার মানে আমারও এমন বউই চাই। অমুকের শাশুড়ি এটা করেছে, ওটা বলেছে। তার মানে আমার শাশুড়িও এভাবে বলবে, ওভাবে করবে।

একের পর এক তুলনার জন্য বাইরের দিকে তাকানো আমাদের বিভ্রান্ত করে। তখন বিভিন্ন মানুষের আদর্শের জোয়ারে আমাদের আন্তরিক চাওয়াগুলো খেই হারিয়ে ফেলে। একবার বান্ধবীর শাশুড়ির মতো শাশুড়ি-মা চাই, আরেকবার বোনের শাশুড়ির মতো শাশুড়ি চাই। কখনো চাচ্ছি আমার বউ-মা আমার ভাইয়ের বউ-মার মতো হোক, কখনো চাচ্ছি বান্ধবীর বউ-মার মতো হোক। খেতে বসে অন্যের প্লেটের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকলে নিজের প্লেটের খাবারটা উপভোগ করা যায় না।

তুলনা করে অবাস্তব প্রত্যাশার দীর্ঘ একটি লিস্ট আপনি তৈরি করে ফেললেন। এর মানে হলো, আপনি নিজেকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনি আপনার শক্তি, ক্ষমতাকে না দেখে যা ধরাছোঁয়ার বাইরে তা নিয়েই পড়ে আছেন। আপনার শক্তি বা দুর্বলতা খুঁজে বের করুন। দুর্বলতাকে সবলতায় কনভার্ট করতে নিজের কাছে আশা করুন।

মানুষ যখন নিজের কাছে চায় তখন চারপাশের সকলের কাছ থেকে তার প্রত্যাশা কমে যায়। নিজের ওপর আস্থা রাখুন, যাতে উপভোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বউ-মা বা শাশুড়ি-মা বা অবাস্তব কোনো প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করতে না হয়।

তাই আশেপাশের মানুষের প্রাপ্তির সাথে নিজের প্রাপ্তিকে তুলনা না করে, আমি কে, আমার জন্য কোনটা ভালো, সেসব নিয়ে চিন্তা করা উপকারী। অর্থাৎ তুলনা

না করে নিজের অথেন্টিক জায়গাটাকে মূল্যায়ন করে এই প্রত্যাশাগুলো ঠিক করা উচিত। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, প্রত্যেকটা মানুষ অনন্য। সবার একটা নিজস্ব গল্প আছে।

- যেকোনো সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী বলুন, বউ-শাশুড়ি বলুন, মা-মেয়ে বলুন, শিক্ষক-ছাত্রই বলেন আর মনিব-ভৃত্যই বলুন, এ ধরনের সম্পর্কের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে অকপট, স্বচ্ছ ও সৎ কথাবার্তার ওপর। অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা আর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যখন খোলা মনে সম্পর্কের সামনে প্রান্তের আরেকজনের সাথে শেয়ার করা হয়, তখন বন্ধন আরও দৃঢ় হয়, একতাবদ্ধ হয়।

আপনি যদি লাগামহীন প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তবে আপনার বউ শাশুড়ির সাথে বসে খোলামেলাভাবে প্রত্যাশাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। একসাথে বসতে দোমনা, দোটানা বা ভয়কে জায়গা দেবেন না। পৃথিবীর লাখো লাখো মানুষের মধ্যে আপনারা একে অন্যের অনেক আপনজন। বউ-মা যেমন সব ছেড়ে শাশুড়ির কাছে আসে, তেমনই শাশুড়িও তার সারাজীবনের একটু একটু করে সাজানো সংসারকে একসময় বউ-মার হাতেই ছেড়ে যান। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে : A Mother gives her daughter birth, A Mother in law gives her daughter in law her life.

পারস্পরিক শ্রদ্ধাকে সমুন্নত রেখে খোলা মনে আপনি কী চান আরেকজনের কাছে তা আলোচনা করে পরিষ্কার করতে পারেন। একে অপরকে প্রত্যাশিত বিষয়গুলো কোনো প্যাঁচ বা ভাব দেখানো বা জটিলতা ছাড়া একদম অকপট বলতে পারলে, প্রত্যাশা পূরণ হোক বা না হোক, আকাঙ্ক্ষার গল্পগুলো অন্তত একে-অন্যের জানা থাকত। তখন আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের ওপর প্রকাশ করার জন্য সহজ হয়ে যেত।

তবে এসব আলোচনায় কেউ যদি মনে করে, কেন জানবে না, এসব আবার বলে দিতে হয় নাকি! তখন সে যা চায় তা খুব ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলে! যেমন : 'এতদিন হলো বিয়ে হয়েছে এখন জিজ্ঞেস করছে শাশুড়ি কী চায়?' কথায় এ ধরনের কপটতা থাকলে তো সামনেরজন আপনার সাথে কথা বলতেই ভয় পাবে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে, তাই না?

ইগোটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, প্রত্যাশাগুলো ঠিক ঠিকভাবে একে অন্যের সাথে শেয়ার করে বাস্তবে তা প্রাপ্তির পথকে উপভোগ করুন।

৪. রাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

রাগ চেনে না বা রাগ করতে দেখেনি এমন কেউ আছে? কেউ যদি নিজে রাগ নাও করে, তবে অন্যের রাগান্বিত চেহারা সে নিশ্চয়ই দেখেছে। রাগ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমিরে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

একবার এক সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় এবং বললেন, অমুক আমার দাঁত ভেঙে দিয়েছে। আমি কিসাস নেব এবং তারও দাঁত ভেঙে দেব। হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বোঝালেন, ওই লোকের দাঁত ভেঙে তোমার কী লাভ হবে? তারচেয়ে বরং অর্থদণ্ড আরোপ করি এবং এর মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যাক। কিন্তু তিনি অনড়, না আমি আপস করব না। আমিও তার দাঁত ভেঙে দেব।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, ঠিক আছে তোমার এই অধিকার আছে। ওই সাহাবী যখন এই উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তখন সম্ভবত হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি তার দাঁত ভাঙতে চলেছ, কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। তিনি বললেন, কী কথা?

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এখন পর্যন্ত তুমি বোঝো না সে তোমার দাঁত ভেঙেছে, কিন্তু তুমি যদি তার দাঁত ভাঙতে গিয়ে তার চেয়ে বেশি জোরে আঘাত করো, তখন তুমি হবে জালিম এবং আল্লাহর দরবারে অপরাধী। আর যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও, তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারও অত্যাচার ক্ষমা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন ক্ষমা করবেন, যেদিন তার ক্ষমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে।

সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিজে তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছ থেকে শুনেছেন? আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি।

সাহাবী বললেন, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।[৫৫]

উল্লেখ্য, সাহাবীর রাগ হয়েছে এবং রাগটা কতটা নিয়ন্ত্রণে যে, উনার দাঁত ফেলে দেয়ার পরে উনি নিজেই সাথে সাথে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারতেন। তখনই অপরজনের দাঁতও ফেলে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে আমীরের কাছে বিচার চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আমীরের কথা মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের রাগের বহিঃপ্রকাশকে যদি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তবে রাগ হলেও এর বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ায় আর আফসোস করতে হবে না, ইনশাআল্লাহ।

বউ-মা ও শাশুড়ির যৌথ পদক্ষেপের মধ্যে এবারে রাগ সম্পর্কিত সচেতনতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সত্যি বলতে এই চ্যাপ্টারটা শুধু বউ-মা বা শাশুড়ি-মার জন্যই না। মোটামুটি আমাদের সবার জন্যই, কারও জন্য তেমন নির্দিষ্ট না।

রাগ আমাদের কোনো অভ্যাস না; ভালোবাসা, ঘৃণা যেমন একটি আবেগ তেমন রাগও একটি আবেগ। মনোবিজ্ঞানী স্পিলবার্গের মতে রাগ একটি মানসিক অবস্থা, যার তীব্রতা, হালকা ইরিটেশন থেকে Intense Furry and Rage এ পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য আবেগের মতো রাগও শরীর-মনে পরিবর্তন আনে।

আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, রাগ একটা স্বভাবগত বিষয়। এটা সৃষ্টি হওয়া মানুষের এখতিয়ারের বিষয় নয়। এ জন্য শুধু ক্রোধ সৃষ্টি হওয়াতে দোষ নেই। তবে ক্রুদ্ধ হওয়ার পর যে কাজগুলো করতে ইচ্ছা হয় তা করে ফেলা, যদি তা বৈধ মাত্রা অতিক্রম করে, নিন্দনীয়।[৫৬]

রাগ নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো, তাতে মনের ভেতরে আবেগের একটি অংশ হিসেবে রাগ আসতেই পারে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ঘটনার কারণেই রাগ হতে পারে। বাইরের কোনো মানুষের কাজ বা কথাবার্তা থেকে রাগ হতে পারে। আবার ব্যক্তিগত কোনো ব্যর্থতা বা সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন-উদ্বেগের কারণেও রাগ হতে পারে। কোনো ক্ষোভের স্মৃতি থেকেও রাগ হতে পারে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, বিপদ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার সময়, কারও যেকোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার সময় (যেমন যুদ্ধের মাঠে), যেকোনো হুমকির

৫৫. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২৭৫৩৪। সহীহ লিগায়রিহি।
৫৬. ইসলাহী মাজালিস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫

মুখে যে আবেগ আমাদের পদক্ষেপকে শক্তিশালী করে, তা হলো রাগ। আমাদের টিকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাগ প্রয়োজন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগান্বিত হওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে রাগ করা জায়েয ও মুবাহ। যেমন : ন্যায়সংগতভাবে বদলা নেয়া।[৫৭]

আমরা সবাই বিশ্বাস করি, রাগ খারাপ, ক্ষতিকর। তাই চিন্তার মধ্যে কখনো রাগকে জায়গা দিতে চাই না। তাই রাগকে সমূলে উৎপাটন করতে চাই। যখন এটা করতে পারি না তখন এইটা মনে করে আবার রাগ করি যে, কেন আমি রাগ নির্মূল করতে পারছি না! যখন রাগকে আমাদের একটা অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়, তখন এটাকে ম্যানেজ করা তুলনামূলক সহজ হয়।

রাগ করা বা রেগে যাওয়া কোনো সমস্যা না। সমস্যা হলো ওই রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা যা যা করি—হয়তো বাজে কথা বলি, হয়তো চিৎকার করি, ভাঙচুর করি, মারধর করি—সমস্যা আসলে এগুলোতে।

বুদ্ধিমান মানুষজন রাগের বহিঃপ্রকাশে ক্ষিপ্ত হয় না। যার রাগের প্রকাশ মানুষ কম দেখে, তাকে আর রাগী মানুষ বলে না।

যেমন ধরুন দুজন মানুষ পাশাপাশি বসে আছে। যে কারণেই হোক, তাদের মাঝে কোনো রাগের ইস্যু তৈরি হয়েছে। একজন চরম চিল্লাচিল্লি শুরু করলেন, লাথি দিয়ে চেয়ার উল্টে ফেললেন। আরেকজনও চরম রেগে গেছেন; কিন্তু চুপচাপ আছেন। মানুষ দেখলে মনে করবে, প্রথমজন বেশি রাগী। হয়তো হিসাব করলে দেখা যাবে দুজনের রাগের তীব্রতা প্রায় একই। এ রকম অহরহ ঘটে। রাগের হাজার হাজার নজির আপনি আমি জানি।

রাগের সময় চিন্তার কয়েকটা দিক

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, রাগ সম্পর্কিত 'আবেগ' ও 'আচরণের' সাথে আরেকটি শব্দ সমান গুরুত্ব পাবে, তা হলো 'চিন্তা'; রাগের সময় যে চিন্তাগুলো হয়।

রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যে আচরণগুলো আসে তার ওপর যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ আনতে চাই, তবে সবার আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে—কী কী

৫৭. ইসলাহী মাজালিস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১

চিন্তা ওই সময় আমার মাথার মধ্যে এল। যার ফলে রাগের মতো একটি অনুভূতি তৈরি হলো, আমি রেগে গেলাম, বাজে কথা বলে দিলাম।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে রেগে যাই। কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ করলে বুঝে আসে, একেক পরিস্থিতিতে একেক রকম চিন্তা আমাদের মাথায় খেলা করে। এই চিন্তাগুলো আমাদের রাগিয়ে দেয়।

দেখা গেল কারও কাছে কিছু চাই, কিন্তু সেটা পাচ্ছি না। কিছু বোঝাতে চাচ্ছি, কিন্তু বোঝাতে পারছি না। মন চাচ্ছে একরকম, হচ্ছে আরেক রকম। এসব চিন্তাগুলো থেকে তখন বিভিন্ন রাগের এক্সপ্রেশন চলে আসে। এ সময় একমুখী চিন্তায় ফোকাস না করে, ভিন্ন কোনো চিন্তাকে বেছে নেয়া যায় কি না? তখন যেকোনো পরিস্থিতিতে রাগ না; বরং যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়।

আমরা যখন রেগে যাই, তখন অনেকগুলো প্যাটার্নে চিন্তাগুলো হতে থাকে :

* চাহিদা

আমরা অনেক কিছুই নিজেদের মতো করে চাই বা প্রত্যাশা করি। কিন্তু সবকিছু আমাদের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে না। এই বাস্তবতা বা প্যারাডক্সকে মেনে নিতেই হবে। যেমন : শাশুড়ি চাচ্ছেন বউ-মা শ্বশুরবাড়ির সব কাজ নিজের দায়িত্বে করুক; কিন্তু বউ-মা শাশুড়ির প্রত্যাশামতো কাজ করতে পারছে না। অথবা শাশুড়ির এই ইচ্ছাটা বউ-মা মানতে নারাজ। শাশুড়ি বউ-মাকে এই যে একটা কথা মানাতে ব্যর্থ হলো, এই ব্যর্থতা থেকে শাশুড়ির মনে রাগ তৈরি হতে পারে।

আবার ধরুন বউ-মা মনে করল, আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে আছি, কোথায় আমাকে যত্ন-আত্তি করবে তা না, আমাকেই সবার দেখাশোনা করতে হবে। বউ-মার এই আশা যখন পূরণ হয় না, মনে মনে তার রাগ হতে পারে।

এককথায় নিজের চাহিদাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন, আপনার রাগের বাজে বহিঃপ্রকাশের পেছনে আপনার চাহিদাগুলো দায়ী কি না।

* ভুল বিশ্বাস

অনেক সময় বলি, আমি বলে এই সংসার টিকেছে, অন্য কেউ হলে এমন করে সংসার করত না! এ ধরনের বিশ্বাস থাকলে খারাপ চিন্তাগুলো চ্যালেঞ্জ করার শক্তিটা তো প্রথমেই চলে গেল। তখন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আগেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি। ফলে ওই হতাশা থেকে রাগ তৈরি হয়;

বরং এভাবে চিন্তা করা—মানুষের জীবনে বড় বড় অনেক সমস্যা আসে, আমিও অনেক সমস্যার সমাধা করেছি; ইনশাআল্লাহ সামনের সমস্যাও সমাধা করতে পারব।

* শব্দের মাধ্যমে বিপর্যয়

রাগের সময় অনেকে 'সব সময়' 'কখনোই' 'কোনোদিন' 'সারাজীবন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। এই ধরনের শব্দগুলো পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে বানিয়ে দেয়। সাথে সাথে তখন বিশ্বাস করা হয়, শুধু আমার সাথেই এমন ঘটনা ঘটছে, সব ক্ষেত্রে আমিই ভিকটিম।

তখনই চিন্তাটাকে যদি এভাবে পরিবর্তন করা যায়, এমন শুধু আমার সাথে না, অনেকের সাথে ঘটে। আমার মতো ভুক্তভোগী অনেকেই আছে। তখন সাথে সাথেই নিজের অসহায়ত্ব কিছুটা কমে। অসহায়ত্ববোধ কমার সাথে সাথে নিজের প্রতি রাগটাও কিছুটা কমে।

* বিকৃত বিশ্বাস

আমাদের আশেপাশে অনেক রাগের ঘটনা ঘটে যেখানে একটি Distorted Believe কে নার্সিং করা হয়। অনেকে এমন একটা বিশ্বাস মনের মধ্যে পুষে রেখে রাগ করে বা কষ্ট পায়, যেটার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সামনের পক্ষের যেকোনো আচরণেই ভিত্তিহীন রাগের জন্ম নেয়। আসলে ঘটনা কিছুই না।

যেমন কোনো বউ-মার মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, শাশুড়ি তাকে জাদুটোনা করেছে, আর এই কারণে তার শরীর খারাপ। এখন শাশুড়ি মনে মনে সূরা ইয়াসীন পড়ে যদি বউ-মার জন্য দুআও করে, বউ-মা তখন ভাবতে থাকে, ওই যে বুড়ি জাদুমন্ত্র পড়ছে। এবং তখন শাশুড়ির সব কথা বা কাজেই তার তীব্র রাগ হতে পারে।

* ভিলেনের মুখোমুখি

যখন আমরা কারও ওপর রাগ করি তখন তাকে একটা ভিলেন ক্যারেক্টার হিসেবে দেখি। তার সব খারাপ, তার মধ্যে ভালো কিছু নেই। সে একটা দায়িত্বহীন, অবিবেচক, আরও কত কী! একটা গ্লোবাল রেটিং করে ফেলি। মোটাদাগে সব খারাপ। কিন্তু দোষে-গুণেই তো মানুষ। মানুষের ভালো দিক যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। এটা খুবই স্বাভাবিক।

রাগের সময় আপনার মাথায় যদি এ ধরনের চিন্তাগুলো খেলে যায় তখন আপনি কয়েকটা কাজ করতে পারেন। যেগুলো সচেতনতার সাথে প্র্যাকটিস করলে, রাগের Wise Management কিছুটা হলেও সহজ হয়।

তাৎক্ষণিক রাগ নিয়ন্ত্রণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

'যদি তোমাদের কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তবে তার উচিত বসে পড়া। যদি তার রাগ কমে যায়, তবে ভালো; নয়তো তার উচিত শুয়ে পড়া।'[৫৮]

অযু করতে পারেন। 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম' পড়তে পারেন। প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকতে পারেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ হিসেবে আরও বলেছেন, রাগান্বিত অবস্থায় অযু করতে, যা রাগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একটি উত্তম পদ্ধতি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

৫৮. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ২১৩৪৮; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৭৮২। হাসান সহীহ।

'রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে; শয়তানকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে, আর একমাত্র পানির মাধ্যমেই আগুন নেভানো সম্ভব। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তার উচিত অযু করা।'[৫৯]

এ ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের কথাও বলেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'আমি এমন একটি কালেমা জানি, যা পাঠ করলে ক্রোধ দূর হয়ে যায়। (আর তা হলো) 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম', অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[৬০]

- মনোবিজ্ঞানীদের মতে, জায়গা পরিবর্তন করে কিছুক্ষণ একা থাকার চেষ্টা করা। এটা ৪৫ মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টার মতন। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে পারেন। যেকোনো Anger Episode এ হার্ট রেট বেড়ে যায়। গভীরভাবে নিশ্বাস নিলে এটা কিছুটা স্বাভাবিক হয়। রাগের সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া মনটাকে এক জায়গায় আনার জন্য মাইন্ড Angchoring করতে পারেন। নিজের আঙুলগুলোতে প্রেস করতে পারেন।

- আমরা যখন ভীষণভাবে রেগে যাই তখন ছোট্ট একটা টাইম গ্যাপ নেয়া খুব জরুরি। যেমন ধরুন, শাশুড়ির কোনো একটা উপদেশ শুনে আপনি রেগে গেলেন। শাশুড়ির কোনো মতের সাথে একটা বিরোধের জায়গা তৈরি হলো। তখন আপনি মনে মনে বললেন, রেগে চিৎকার করে, ভাঙচুর করে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যাব না; বরং প্রতিপক্ষকে বললেন, আমি রেগে গিয়েছি, ৪৫ মিনিটের আগে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলব না। যখন আমরা রেগে যাই তখনই Sympathic nervous system over react করা শুরু করে। ব্রেইন এটাকে একটা অপছন্দনীয় বিষয় বা Threatful Object এর মতো মনে করে। শরীরে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তখন আমাদের ব্রেইন এর সামনের অংশ Frontal Cortex যা

---

৫৯. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৭৯৮৫; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৭৮৪। সনদ দুর্বল।
৬০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১০

কিনা ক্রিটিক্যাল ডিসিশনগুলো নিয়ে থাকে, সেটা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। রাগের সময় যখন আমরা ৪৬ মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টা টাইম গ্যাপ নিচ্ছি, তখন রাগ ইমোশনের কারণে যে সমস্ত কেমিক্যালগুলো শরীরে নিঃসারণ শুরু হয়েছিল, সেগুলো Base লাইনে আসা শুরু করে। আর তখন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে, তা হলো, রাগের পেছনে থাকা চিন্তাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার যথেষ্ট সময় আপনি পান। রাগকে তাৎক্ষণিক দমনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ—সময় নেয়া।

- যখন কিছুটা রাগ কমবে তখন আপনি অপরজনের সাথে কথা বলতে পারেন যে, কেন আপনি কষ্ট পেয়েছেন, কেন রেগে গিয়েছেন। যাদের কমিউনিকেশন সহজ-সরল, সাবলীল হয়, তাদের তুলনামূলক এ সমস্যায় কম পড়তে হয়। আমরা অনেক রাগ-অভিমান-ক্ষোভ আমাদের ভেতর লুকিয়ে রাখি।

  মনে করি, মানুষ আমাকে দেখে বুঝে নেবে। এটা ভুল প্রত্যাশা। মানুষ আপনার মতো করে আপনাকে বুঝবে, এটা মানুষের কাজ না। এটা ওপরওয়ালা পারেন। তাই আপনার কী ভালো লাগে, কী ভালো লাগে না, পরিষ্কার বাক্যে সোজাসাপ্টা বিনয়ের সাথে সামনেরজনকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। পজিটিভ কমিউনিকেশন ছাড়া Anger Management খুবই কঠিন। তাই রাগ যার সাথেই হোক না কেন, অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে খোলাখুলি আলাপ করে বিষয়টা জানাতে হবে। আপনার যেমন অনুভূতি হচ্ছে ঠিক তেমনটিই অপরপক্ষকে জানানো জরুরি। এটা লুকিয়ে চাপা দেয়ার মতো কিছু না। আবার চিল্লাচিল্লি করে মাথায় তোলার মতো কিছু না। যেকোনো মানসিক দ্বন্দ্বকে সমাধান করার এটাই সহজ উপায়—খোলামেলা আলাপ।

- রাগ হওয়ার সময় আপনি যে ছোট টাইম গ্যাপ নিচ্ছেন, তখন রাগের কারণগুলো খুঁজে বের করুন। রাগের কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো লিখে ফেলুন। আপনার প্রাত্যহিক জীবনে যখন এই ট্রিগারগুলো আসবে তখন ব্রেইন আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠাবে—সচেতন হয়ে যাও, এখন রাগের একটি ট্রিগার আসছে। রাগের কারণ সম্পর্কে সচেতন হতে এটা খুব উন্নত একটি কৌশল।

- রাগকে তাৎক্ষণিক দমন করতে Avoid খুব উপকারী একটি উপায়। রাগ

হয়েছে, চিন্তা করতে হবে এখানে রাগ দেখায়া লাভ কী? বাইরে গিয়েছেন, রিকশাওয়ালার সাথে কোনো ব্যাপারে রাগ হয়েছে; চিল্লাচিল্লি করলেন, মাথাটা গরম হয়ে গেল! রাগে গজগজ করতে করতে বাসায় আসলেন, বরাবরের মতো বাচ্চা কিছু একটা বলল। কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। কান্নাকাটি চিল্লাচিল্লি শুরু হয়ে গেল। চেইনের মতো একটার পর একটা নেগেটিভ এপিসোড ঘটতে থাকল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে Avoid না করতে পারলে এমন সব ঘটনা ঘটবে, যা আপনি কোনো লজিক দিয়ে মিলাতে পারবেন না।

মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে, যেসব ব্যাপারে আমরা হতাশ সেখানে আমরা উগ্র ব্যবহার করি না। ঘটনা ঘটবে এক জায়গায়, আর আপনি রাগ দেখাবেন অন্য জায়গায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রাস্ট্রেশন আপনি ক্যারি করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আপনার ঝাড়ি খাবে। কেউ বুঝে উঠতে পারবে না ঘটনা কী হয়েছে, কেন ঝাড়ি দিচ্ছে? এ ক্ষেত্রেও আপনাকে Avoid প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন ধরুন, আপনার শাশুড়ির ওপর আপনার কোনো ক্ষেত্রে রাগ হয়ে আছে, কিন্তু আপনি তাকে কিছু বলতে পারছেন না। সেই রাগের রেশ ধরে আপনি বাসন ধুয়ে আছড়ে রাখছেন, বাচ্চাকে মারধর করছেন, সংসারের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত। কিন্তু এসবের কোনো কিছুর ওপরে আপনার রাগ না, রাগ হয়েছে অন্য জায়গায়। হতাশাজনক ওই বিষয়গুলোকে Avoid করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে রাগ নিয়ন্ত্রণ

- প্রথমত, ফলাফল বা পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা দরকার। জোরালো গুরুত্ব দিতে হবে, আমার কোনো কাজ যেন আমার খারাপ পরিণতির কারণ না হয়। ধরুন, রাগের মতোই কিছু ঘটেছে, আমি রেগে গেছি, এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি, পরবর্তী সময়ে আমারই খারাপ লাগছে। আফসোস করছি, কেন এমন হলো? শত শত ডিভোর্সের ক্ষেত্রে এ ধরনের ভয়াবহ আফসোসের ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। আমার কোনো কথা বা আচরণ যেন আমাকে দীর্ঘমেয়াদি হুমকির মধ্যে না ফেলে।
- এই ছোট জীবনে চলার পথে অনেক মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক

হবে। বিবাহসূত্রে, প্রতিবেশী হিসেবে, বন্ধুবান্ধব হিসেবে আমরা অনেক মানুষকে পাব। সবাই এক রকম হবে না। একেকজনের মন-মানসিকতা, কর্ম, অবদান একেক রকম। কেউ আনন্দ দেবে, কেউ কষ্ট দেবে। আনন্দ দেয়া মানেই সে শুভাকাঙ্ক্ষী আর কষ্ট দেয়া মানেই সে শত্রু এমনও না। সবার মধ্যে কিছু দোষ থাকবে, কিছু গুণ থাকবে। অন্যদের ভালো কাজ, ভালো গুণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। আর খারাপ দিকগুলো দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। মাঝে মাঝে কিছু না দেখার ভান, নিজেকে ভালো রাখে। রাগের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে এই ভানের বেশ ভূমিকা আছে।

- ঠিক, আমাদের সমাজে বাস করতে হয়। তাই বলে তো সবার সাথে গলায় গলায় ভাব জমানোর দরকার নেই। সবার সাথে এত মেশারও দরকার নেই। আপনি যদি শুরুতেই ঘ্রাণ পান—ওখানে গেলে, ওর সাথে মিশলে বাজে কথা বলবে, আমাকে বিরক্ত করবে, আমি রেগে যাব, সেই রাগ নেগেটিভ Bias এর মতো বয়ে বেড়াব, তবে সেই সমস্ত জায়গাগুলো বা ঘটনাগুলো সচেতনতার সাথে এড়িয়ে চলাই ভালো। ঘটনা ঘটার আগেই ঘটনাকে বাদ দিয়ে গেলেন।

- ঠিকঠাকভাবে মনের কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারা অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর একটি গুণ। এটা যারা পারেন, তাদের রাগের মুখ খুব কমই দেখতে হয়। তারা নিজেরা খুব সহজে মানুষকে বুঝতে পারে, অন্য মানুষরাও তাদের খুব সহজে বুঝতে পারে। ঠিক ধরেছেন—যোগাযোগ দক্ষতা। এই গুণটি রাগের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করে দেয়। এই দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আপনি চেষ্টা করতে পারেন।

- একটা সুন্দর লাইফস্টাইল আপনাকে একটা ধীরস্থির, ঠান্ডা, মাটির মানুষে পরিণত করতে পারে। একটা মানুষ যখন ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে, তখন তার নিজের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। নিজের স্টকে যখন ভালোবাসা থাকে তখন অন্যকে সেটা দেখানো যায় বা দেয়া যায়। অপরদিকে এলোমেলো জীবনের একজন, নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ থাকে। তখন নিজের প্রতি ব্যর্থতা ও ব্যর্থতা থেকে রাগের সৃষ্টি হয়। এরপর আপনার স্টকে যে রাগ আছে সেটাই তখন আপনি অন্যকে দেখান বা দেন।

- আরেকটি গুরুত্ব দেয়ার মতো বিষয় হলো—জীবনের শেষ থেকে জীবনটাকে

দেখা। আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে এসেছি। একসময় কেউ থাকব না। এটা খুব জরুরি একটা চিন্তা যে, আমরা আমাদের হাসি দিয়ে, সবর দিয়ে আরেকজন মানুষের জন্য কতটুকু আরাম পৌঁছাতে পেরেছি? আমরা খুব দ্রুত চলে যাব। খুব দ্রুত সবাই আমাদের ভুলে যাবে। তাই আমরা সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ চাইব না, আমি কারও জীবনে একটি কষ্টের, আতঙ্কের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকি; বরং সুস্থ মস্তিষ্কের একজন চাইবেন, তার হাসিটুকু মানুষ মনে রাখুক, সবরটুকু স্মরণে রাখুক। যারা রাগী, তাদের ক্ষেত্রে মানুষের মনে এই অনুভূতি ঠাঁই পায় না। যদি মনে করেন রাগী না হলে সুপেরিয়র হয়ে থাকতে পারবেন না, তবে এটা ভুল। দয়ালু হলে, বিনয়ী হলে কেউ মাথায় চড়ে বসবে না। অন্তরে জায়গা দেবে।

কেউ রাগী মা চায় না, কেউ রাগী বাবা চায় না, কেউ রাগী স্বামী/স্ত্রী চায় না, কেউ রাগী বউ-মা চায় না, কেউ রাগী শ্বশুর-শাশুড়ি চায় না, কেউ রাগী জামাই চায় না, কেউ রাগী ছেলে-মেয়ে চায় না। কেউ না। তাহলে কিসের জন্য এত রাগ?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

'সে প্রকৃত বীর নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।'[৬১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

'অতএব তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগমাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী, তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে। যারা

৬১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৯

বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে।'[৬২]

আল্লাহর ক্ষমা পেতে হলে তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করতে হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন।'[৬৩]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ

'যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যেকোনো হুর নিজের ইচ্ছামতো বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন।' [৬৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ

'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান

৬২. সূরা শুরা, (৪২) : ৩৬-৩৭
৬৩. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৩৩-১৩৪
৬৪. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪১৮৬। হাসান।

প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছুতে নেই।' [৬৫]

৫. কিছু কিছু অপছন্দনীয় বিষয় মেনে নেয়া

আপনাকে যদি বলা হয়, আপনার বউ-মার এমন পাঁচটি সত্য দোষের কথা বলুন, যা আপনি পছন্দ করেন না কিন্তু মেনে নেয়া যায়। অথবা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শাশুড়ির এমন কিছু খারাপ আচরণের কথা বলুন, যা পুত্রবধূ হিসেবে আপনি মেনে নিতে পারেন।

আপনি হয়তো বলবেন, আমি পছন্দ করি না তাহলে কেন মেনে নেব? এমন একটা জিনিস কেন তার মধ্যে থাকবে? কেন সে এটা থেকে বের হয়ে আসবে না?

আপনি মেনে নেবেন। কারণ আপনি যেমন নির্ভুল, নিষ্পাপ, পারফেক্ট না; কোনো বউ-মাও নির্ভুল না, কোনো শাশুড়িও নির্ভুল না। আপনি আশেপাশে যাদের দেখছেন—আপনার ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, ভাই-বোন–কেউ নিখুঁত না। আপনার অন্ধ মহব্বতের কারণে হয়তো কারও কারও দোষ আপনার চোখে পড়ছে না। বাস্তবে তাদের মধ্যেও অসংখ্য দোষ আছে, যা আপনি মেনেই নিয়েছেন। জানা, না-জানা অসংখ্য দোষ-গুণ সাথে নিয়েই আমাদের বছরের পর বছর একসাথে কাটাতে হয়।

অবশ্য, ধর্মীয়-সামাজিক কোনো আইনেই বৈধ না এমন বিষয়গুলোকে কেউই মেনে নেবেন না। এসব মেনে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে না। সীমার ভেতরের বিষয়গুলো কমবেশি মেনে নেয়া যায়। যেসব পরিবারে এই মেনে নেয়াটা কম, সে ঘরগুলোতে একবার ঢুকলে মনে হয় না আর কোনোদিন ঢুকি। সারাক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালি অবিরাম।

অন্যের ভুল মেনে নেয়ার মানসিকতা না থাকলে ভুলগুলোকে খুব স্পষ্ট, চকচকে মনে হয়। তা ছাড়া তখন খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, হঠাৎ করেই যেন ভুলগুলো বেড়ে যাচ্ছে। ভুল খোঁজা হলে ভুল বাড়তেই থাকবে। ভুলগুলো যখন খুঁটিয়ে দেখা শুরু করবেন তখন অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, আরে তার তো এটা ভুল, ওটাও তো ভুল। হায় হায় আচরণে এত সমস্যা!

---

৬৫. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ৪১৮৯। হাসান সহীহ।

যেমন ধরুন, শাশুড়ি-মা মনে করছেন, আমার বউ-মা চটপট কাজ করতে পারে না। কেন গুছিয়ে কথা বলে না, কেন ঘর গুছিয়ে রাখে না? এই বয়সে এত অলস কেন হবে! আবার ধরুন, বউ-মা মনে করছেন, আমার শাশুড়ি কেন এমন না? কেন চিল্লাচিল্লি করে? কেন নরমভাবে কথা বলে না? একটা আছে তো আরেকটা নেই কেন? এটা এমন তো ওটা অমন কেন?

বাস্তবে সমস্যা তো থাকবেই। মানুষ তো। নবী-রাসূল তো না। তার মধ্যে তো দোষ-ভুল থাকবেই। এ আর নতুন কী? ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে সমস্যাগুলোকে খুব হালকা মনে হলেও, অনেকে এই সমস্যাগুলোকে এত বড় করে দেখেন—পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে! মনোবিজ্ঞানীদের বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের গবেষণাতে এমনটাই দেখা যায়।

এখন একটি প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে। সব সময় যদি দুর্বলতাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে ঘরে দুর্বল দিকগুলো বেড়ে যাবে না? তাহলে দোষের সয়লাব হবে। কীভাবে নিজেদের ইমপ্রুভমেন্ট হবে?

আসলে মেনে নেয়া বলতে বোঝায় সাময়িকভাবে তর্কে না জড়ানো। তর্ক করলে শুধু সম্পর্কটাই নষ্ট হয়, তেমন কোনো বেনিফিট পাওয়া যায় না। তর্কে জিতে কয়জন লাভবান হয়?

মনোবিজ্ঞানীদের মতে মেনে নেয়া হলো ইমপ্রুভমেন্টের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। আপনি ইমপ্রুভমেন্ট চান, অবশ্যই আপনাকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ প্রক্রিয়ার শুরু হয় মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে। সমস্যাটাকে মেনে নিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য আপনি তার সাথে Aline হয়ে গেলেন। আপনার বিরোধের জায়গাটা অন্তত কমে গেল। সমস্যাটাকে মিটাবার করার জন্য এবার আপনি একটি Space পাবেন।

ধরুন, আপনার বউ-মা কিছুটা আরামপ্রিয়। ঘরদোর তেমন একটা গুছিয়ে রাখতে পারে না, বউ-মার এদিকটা শাশুড়ি পছন্দ করেন না। তিনি দেখতে পান, এ রকম অগোছালো-এলোমেলো কোনো মেয়ের হাতে আমার সংসারটা পরলে এই সাজানো সংসারটা একসময় আর এমন থাকবে না! এই নেতিবাচক কল্পনার সাথে সাথে শাশুড়ির আচরণ নেতিবাচক হওয়া শুরু করবে। এখন শাশুড়ি, বউ-মার এই বিষয়টিকে সংশোধনের নিয়তে কিছুদিনের জন্য মেনে নিয়ে সময়

দিতে পারেন। এতে সম্পর্ক নষ্ট হলো না। সম্পর্ক ভালো থাকলে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কাজ করা সহজ হয়। এ সময়ের মধ্যে এলোমেলো-অগোছালো থাকার ক্ষতিকর দিকগুলো বউ-মার সামনে তুলে ধরতে পারেন। বউ-মার যদি শেখার ইচ্ছে থাকে তবে এই প্রক্রিয়ায় সে শিখে যাবে। আর শেখার ইচ্ছে যদি না থাকে, আপনি অনেক ভালো ভালো পদ্ধতি প্রয়োগ করেও উপকার পাবেন না।

এখন আপনি মনে করলেন, আপনি দোষ মেনে নেবেন এবং সাথে সাথে দুর্বলতাগুলোকে ধীরে ধীরে সবলতায় পরিবর্তন করবেন, তাহলে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে; তা হলো–ধারণা, সুধারণা। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রাখা।

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে মানুষ যখন নেতিবাচক চোখে কোনো কিছু দেখে, তখন সবকিছুতেই বিপদের গন্ধ পায়; এমনকি তখন পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়া অনুভব করে। যখন শুকরিয়ার চোখে দেখে, তখন এই নজরটাই আমাদের তৃপ্তি দেয়।

আপনি যদি কারও ক্ষেত্রে মনে করেন, সে আপনাকে পছন্দ করে না; এটা মনে করার সাথে সাথে আপনার আচরণগুলোও অপছন্দনীয় আচরণে পরিবর্তন হয়ে যায়। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, অপছন্দনীয় কারও সামনে মানুষ এমন-সব আচরণ করে, যা পছন্দ করার মতো না। আপনি যদি মনে করেন, আপনার শাশুড়ি আপনাকে ভালোবাসে না, তাহলে আপনার শাশুড়ির সামনে আপনার আচরণগুলো এমন হয়ে যাবে, যার দ্বারা ভালোবাসা পাওয়া যায় না। বউ-মা বা শাশুড়ি যদি একে অন্যের প্রতি সুধারণা রাখতে পারে, তবে কথা বলার আগেই অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।

৬. আত্মমুগ্ধতা বা উজব সম্পর্কিত সচেতনতা

বউ-মার মনে হতে পারে, শ্বশুরবাড়ির জন্য আমি যা করেছি, আমার কোনো জা, দেবর, ননদ কেউ এতটা করেনি। শাশুড়ির ভালোবাসা এমনি পাওয়া যায় না! এই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যা করা লাগে সবই আমি করেছি। অনেক কুরবানী করে এই পরিবারে আমি জায়গা করে নিয়েছি।

পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট ভালো, কারণ আমি পাগলের মতো পড়েছি। আমার

গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, কারণ আমি অনেক পরিশ্রম করে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছি। আমার হৃদয়জুড়ানো সন্তান-সন্ততি আছে, কারণ আমার প্যারেন্টিং-কৌশল ভালো। আমি অমুক সমস্যা সহজে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, কারণ আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ও দূরদর্শী ছিল। আমি এখন সুন্দর করে কথা বলতে পারি, কারণ এর ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর অনুশীলন আছে। এ সমস্ত অর্জন আমার প্রচেষ্টা আর পরিশ্রমের ফল।

শাশুড়ি-মা মনে করতে পারেন, আমি যখন এ সংসারে এসেছি তখন কিছুই ছিল না, একটু একটু করে সবকিছু করে তুলেছি। দিন নেই রাত নেই কাজ করেছি। নিজে গরু পুষে দুধ বিক্রি করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছি। মানুষের মতোন মানুষ করেছি। আজ এই বাড়ি-গাড়ি, সহায়-সম্পত্তি যেখানে যা কিছু দেখছ, সব একদিনে হয়ে যায়নি, অনেক কষ্টের ফল। এমনকি কোনোদিন কারও ক্ষতি করিনি, ক্ষতি হোক এটাও কখনো চাইনি। এটা আমাদের বংশের ধারা। আমাদের বাপ-দাদারাও এই পথে হেঁটেছে, তাদের দেখে আমরাও হেঁটেছি।

কোনো নিয়ামত অর্জনের পর ভাবনায় খুব সূক্ষ্মভাবে এ ধরনের চিন্তা আসতে পারে। হ্যাঁ, খুব কষ্ট করেই সে নিয়ামত অর্জন করেছে, সফল হয়েছে। এটা না অহংকার, না রিয়া, না ইগো, না সেলফ লাভ। এটা একধরনের মুগ্ধতা, একধরনের উল্লাস। এটাই আত্মমুগ্ধতা বা 'উজব'। ভারসাম্যহীন প্রত্যাশা, অযাচিত সমালোচনা, বিদ্রুপ, অন্যকে খুব সহজে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, এমনকি অহংকারের সূত্রপাতও এই উজবের হাত ধরেই। শুধু বউ-মা, শাশুড়ি-মা'ই না, এ বিষয়টাতে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া দরকার।

মালিক গোলামের বেপরোয়া উল্লাস পছন্দ করে না। মালিক তো জানিয়ে দিয়েছেন,

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

'তুমি উল্লসিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ উল্লসিতদের ভালোবাসেন না।'[৬৬]

যেকোনো ভালো কাজ করতে পারা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তেমনই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারাও দয়াময় মালিকের নিয়ামত।

---

৬৬. সূরা ক্বসাস, (২৮) : ৭৬

ওই যে আমরা পড়ি 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ' (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ), এর অর্থই তো হচ্ছে : ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে।

কেউ যখন ভাববে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী ও করুণায় আমি একটি ভালো কাজ করতে পারলাম, তখন সে কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়বেই। মনে হবে না সব আমার প্রাপ্য।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

'তুমি বলো, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই তা হয়েছে। তাই তারা যেন এতে আনন্দিত হয়।'[৬৭]

এ আনন্দ শোকর আদায়ের আনন্দ। নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আনন্দ।

নিয়ামত পেয়ে বান্দা আনন্দিত হবে—দয়াময় প্রভুর নিকট এ দৃশ্য পছন্দনীয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার মাঝে তাঁর দেয়া নিয়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন।'[৬৮]

আর বান্দা যখন নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতায় নতশির হয় না, মনের গভীর থেকে বিনয়ের সঙ্গে তার মুখ থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারিত হয় না, তখন এ নিয়ামত তার আর নিয়ামত থাকে না।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন

---

৬৭. সূরা ইউনুস, (১০) : ৫৮

৬৮. সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৮১৯। হাসান সহীহ।

যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো তবে তোমাদের আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৬৯]

আসলে এ কৃতজ্ঞতাবোধও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একপ্রকার নিয়ামত। তাই তো পবিত্র কুরআনেই আমাদের এ দুআ শেখানো হচ্ছে,

رَبِّ اَوْزِعْنِیْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করুন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করে দিন, আমি আপনার দরবারে তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের (মুসলমানদের) একজন।'[৭০]

আমাদের পাওয়া সমস্ত নিয়ামতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আদায়ে বড় বাধা হলো 'আত্মমুগ্ধতা'। অন্তরজুড়ে যখন নিজের প্রতি মুগ্ধতা থাকে তখন মালিকের প্রতি খুব একটা মুগ্ধ হওয়া যায় না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মতে আমলকারীর করণীয় এই যে, সে নিজের যোগ্যতা মনে করবে না; বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে করে শোকরগুজার করবে। এভাবে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার দ্বারা কাজ করিয়েছেন, নতুবা আমার কী শক্তি ছিল! বাদশাহর কাজ করছ বলে মনে কোরো না তুমি বাদশাহর প্রতি অনুগ্রহ করছ; বরং তারই অনুগ্রহ যে তোমাকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।[৭১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করেছেন,

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

৬৯. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৭
৭০. সূরা আহকাফ, (৪৬) : ১৫
৭১. ইসলাহী মাজালিস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯

তিনটি বিষয় মারাত্মক ধ্বংসাত্মক :
এক. অত্যধিক কৃপণতা
দুই. প্রবৃত্তির অনুসরণ।
তিন. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধতা।[৭২]

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি.-এর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন,

اَلْهَلَكَةُ فِي اثْنَتَيْنِ: فِي الْقُنُوطِ وَالْإِعْجَابِ

মানুষ দুই কারণে ধ্বংস হয়—এক. নৈরাশ্য, দুই. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধতা।[৭৩]

কারণ, মানুষের সফলতার জন্যে যে চেষ্টা অনিবার্য, সে চেষ্টা নিরাশ ও আত্মমুগ্ধ উভয়েই ছেড়ে দেয়। নিরাশ যে, সে যেমন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ধ্বংস হয়; একইভাবে যে নিজের প্রতি মুগ্ধ সেও ভাবে, আমি তো সফল হয়েই গেছি। আমার লক্ষ্য এখন আমার হাতের মুঠোয়। এখন আমিই সেরা। এই ভাবনা তাকেও চেষ্টা ও সাধনা থেকে বিরত রাখে। একসময় সেও নিচের দিকে নামতে থাকে।

আত্মমুগ্ধতা যে কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে হুনাইন যুদ্ধের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি।

যারা ঘরের সম্পর্কগুলোকে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করতে চায়, যারা সমাজের জন্য কাজ করতে বা কোনো অবদান রাখতে চায়, তাদের জন্য ভয়ংকর এক হুমকি এই আত্মমুগ্ধতা। সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষটা আত্মমুগ্ধতার হাত ধরেই অহংকারের সীমানায় পৌঁছায়।

আত্মমুগ্ধতা থেকে নিজের বিশ্বাসটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে হয়তো বিনয়ী হওয়া বা আরেকটু বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া বেশ খানিকটা সহজ হয়ে যেত।

৭. মনঃকষ্ট বা যেকোনো সমস্যা শেয়ারের জন্য সঠিক মানুষ নির্বাচন

দুঃসম্পর্কের কারও সাথে তেমন একটা সমস্যা আমাদের হয় না, দুঃখ পাওয়ার

---

৭২. তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ৫/৩২৮ [৫৪৫২]; বাইহাকী; শুআবুল ঈমান, ২/২০৩ [৭৩১]। হাসান লিগায়রিহি।

৭৩. ওয়াকি ইবনুল জাররাহ; কিতাবুয-যুহদ, ৩৫২

মতো তেমন কিছু ঘটে না। কিন্তু কাছের মানুষদের সাথে একসাথে চলতে মাঝে মাঝে ঠুকাঠুকি বাঁধে। মনে হয়, ও আমার এত আপনজন, কাছের মানুষ, তারপরও এ রকম সমস্যা হচ্ছে? অথচ কাছের মানুষ বলেই তো হচ্ছে। দূরের কেউ হলে তো সে আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকত।

বউ-মা এবং শাশুড়ি-মা খুব কাছাকাছি সম্পর্কের দুজন নারী। যেকোনো পুরুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র। দুইটি চরিত্রই এত গুরুত্বপূর্ণ যে, গুরুত্ব আর গুরুত্ব একে অন্যকে অনবরত ধাক্কাতে থাকে। এই ধাক্কাধাক্কিতে কখনো বউ-মা আহত হয়, কখনো শাশুড়ি-মা আহত হয়। ঘা শুকিয়ে গেলে সব আবার ঠিকঠাক হয়। কিন্তু এ ঘা শুকাতে কার কত বেগ পেতে হয় তা সেই মানুষটাই বোঝে।

যেকোনো সম্পর্ক থেকে কেউ যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন তার একটি বিষয় ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়—তা হলো ভেন্টিলেশন বা দুঃখ-কষ্ট শেয়ারিং।

দুঃখ, আনন্দ, ভয় বিভিন্ন ধরনের আবেগ নিয়ে আমরা চলি। আনন্দিত মুহূর্তগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে যেমন ভালো লাগে, তেমনই দুঃখের কথাগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে ভালো লাগে। ভাগাভাগিতে আনন্দ যেমন বাড়ে, দুঃখ তেমনই কমে। আমরা সবাই কমবেশি এ ধরনের ভাগাভাগি করি। সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের সাথে দুঃখ-কষ্ট শেয়ার করলে একদিকে যেমন সেটা কমে, আরেক দিকে এই সমস্যা থেকে সমাধানের একটি পথ বের হয়। যখন মানুষ বেশি ঝামেলায় থাকে তখন তার মাথা কাজ করে না, আবেগগুলো ঠিক ভারসাম্যপূর্ণ হয় না। তখন তৃতীয় আরেকজনের প্রয়োজন হয়, যে তাকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করবে। কিছু সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়, উৎসাহের প্রয়োজন হয়। মাথার ওপর নির্ভরতার হাতের প্রয়োজন হয়।

এ ক্ষেত্রে কিছু মানুষ বাইরের সবার সাথে ঢালাওভাবে সব ধরনের কথা শেয়ার করেন। কিছু মানুষ আছেন শুধু আনন্দের কথাগুলোকে ঢালাওভাবে শেয়ার করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন আনন্দ বা যেকোনো প্রাপ্তির কথাগুলোকে চেপে রেখে শুধু দুঃখ-কষ্টের কথাগুলোকে শেয়ার করেন। কিছু মানুষ আছেন খুব মেপে মেপে কিছু শেয়ার করেন, আবার কিছু গোপন রাখেন।

কিছু মানুষ আছেন কোনো কথা কারও সাথে শেয়ার করেন না। না আনন্দের

অনুভূতি, না দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি। এ ধরনের মানুষ যে খুব ইন্ট্রোভার্ট হয় এমন না। কিন্তু উনারা রাগ বা ক্ষোভগুলোকে ভেতরে পুষে রাখতে পছন্দ করেন। একসময় যেটা অ্যাটম বোমার মতো বিস্ফোরিত। ১০ বছর, ১৫ বছর পর সেটা অসহনীয় বিরক্তিতে পৌঁছায়। বিরোধগুলো তখন আর মেটানো যায় না।

তবে শেয়ারিং সব সময় উপকারী নাও হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি আপনার শাশুড়ির কোনো আচরণে কষ্ট পেয়েছেন। প্রতিবেশী কারও সাথে সেটা শেয়ার করলেন। এখন এই প্রতিবেশী নির্বুদ্ধিতার কারণেই হোক, শত্রুতার কারণেই হোক আর উসকানি দিতেই হোক, আপনার শাশুড়িকে বোঝানো শুরু করল—আপা, বউ-মার সাথে তো এমন আচরণ করতে হয় না। আপনি বাইরে সবার সাথে এত ভালো আচরণ করেন আর ছেলের বউয়ের সাথে এত খারাপ আচরণ! এটা তো ঠিক না আপা!

ব্যস, আপা তো আরও রেগে গেল। এই বউয়ের জন্য পাড়ার মানুষের কাছ থেকেও অপমানিত হতে হচ্ছে! এখন শাশুড়ির রাগ আরও দশ গুণ বেড়ে বউ-মার ওপর পড়বে, তাই না? তখন আপনি মাথা চাপড়াতে থাকবেন—কেন উনাকে বলতে গেলাম?'

ঠিক এ রকম ঘটনা কিন্তু শাশুড়ির ক্ষেত্রেও ঘটে। তখন একটি বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

আবার ধরুন, বউ-মা মনে করলেন বাবার বাড়ির কারও সাথে, যেমন : মা, খালা, ফুপু, খালাতো, মামাতো, চাচাতো বোনের সাথে তার কষ্টের কথাগুলো শেয়ার করবেন। মেয়ে কষ্টে আছে বা বোন কষ্টে আছে শুনে তাদের তো মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। অত্যধিক মহব্বতের কারণে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টা দেখা তাদের জন্য কষ্টকর হয়। বোনেরা রেগে বলে, এমন সংসার কেন করিস? মা-খালারা বলে, হায় আল্লাহ! ওরা এত খারাপ! বাইরে দেখে আসলে ভেতর বোঝা যায় না।

আবার ধরুন, শাশুড়ি-মা তার কোনো আত্মীয়ের সাথে বউ-মা সম্পর্কে কোনো কষ্টকর কথা আলাপ করলেন। এসব কথা শুনে আত্মীয় জবাব দিলেন, এমন বউ নিয়ে সংসার করার দরকার কী? মেয়ের কি অভাব হইছে? ছেলেটার যোগ্যতা আছে, আবার ভালো দেখে বিয়ে দেয়া যাবে!

বউ-মার কোনো আচরণে হয়তো শাশুড়ি কষ্ট পেয়েছেন। নিজের মেয়ের সাথে যখন শেয়ার করেন, মেয়ে হয়তো এভাবে বলে, এত বড় সাহস! আমার মায়ের সাথে এভাবে আচরণ করেছে? হ্যাঁ, বউ-মার আচরণ হয়তো সত্যিই খারাপ ছিল। সেই আচরণে কষ্টের একটা আগুন শাশুড়ির বুকের মধ্যে চলছিল। দেখা গেল, শাশুড়ি-মা নিজের জ্বালাপোড়া কমানোর জন্য মেয়ের সাথে বললেন। আর মেয়েটা তাতে পানি না দিয়ে ঘি ঢেলে দিল।

আবার আরেক ধরনের সমস্যা দেখা যায়। আপনি কারও সাথে আপনার কোনো সমস্যার কথা শেয়ার করে রাখলেন। পরবর্তী সময়ে কোনো কারণে তার সাথে আপনার শত্রুতা শুরু হলো। বা বোঝাপড়া হচ্ছে না এ ধরনের একটা বিরোধপূর্ণ অবস্থা তৈরি হলো। তখন সে আপনার সমস্যাগুলোকে বা দুর্বলতার জায়গাগুলোকে পুঁজি করে আপনাকে নাজেহাল করবে।

ভুল জায়গায় ভেন্টিলেশন কতটা ভয়াবহ হতে পারে এসবে বোঝা যায়। আমার এই ছোট অভিজ্ঞতায় এমন অনেক মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, যাদের সংসার ভাঙার মূল কারণ ভুল জায়গায় সমস্যা শেয়ার করা। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ভুলে উসকে দিয়েছে। সংসারটা ভেঙে গেছে। বা না ভাঙলেও কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে।

এ ক্ষেত্রে আপনার সচেতনতা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। যাকে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য মনে হয় তার সাথে শেয়ার করতে পারেন। যারা আপনার সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দেয় এবং আপনাকে অন্ধভাবে মহব্বত করে না। আপনি তাদেরকে বেছে নিতে পারেন, যারা নিরপেক্ষভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

আমরা সাধারণত এ ধরনের মানুষের সাথে আমাদের কথাগুলো শেয়ার করার জন্য প্ল্যান করি। মনে মনে খুঁজি। আর খুঁজতে গিয়ে প্রায়ই হতাশ হই। তখন ভুলভাল জায়গায় বলতে থাকি। এখন কথা হলো, সমস্যা বললে যদি সমস্যা আরও বাড়ে, তাহলে বলার কী দরকার? তারচেয়ে বরং ক্ষোভ পুষে রাখি, জ্বলতে থাকি, একসময় ছাই হয়ে যাই!

আপনি যদি খুঁজতে থাকেন তবে একসময় আপনি আপনার সমস্যা শেয়ারের জন্য সঠিক কাউকে পেয়ে যাবেন। যে আপনার কথা শুনে আপনাকে উৎসাহ দেবে।

৮. কৃতজ্ঞতা

ধরুন, আপনি একজন বিবাহিতা। কয়েক মাস হলো বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে বেশ মহব্বত করেন। শ্বশুরবাড়ির মানুষজনের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। কিন্তু প্রায়ই আপনার মনের মধ্যে খচখচ করে—আমার বিয়েটা এ পরিবারের না হয়ে আরও ভালো কোনো পরিবারে হতে পারত। ফ্যামিলিটা যেন কেমন! কিন্তু আপনি চিন্তাও করতে পারেন না, বিয়ের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সম্পর্ক চুকে যাক। এমনকি আপনি এটাও চান না শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ সবার সাথে আপনার সম্পর্ক খারাপ থাকুক। দেখা গেল, আপনি সংসারের জন্য সবই করছেন, শ্রম দিচ্ছেন; সাথে সাথে এই আপনিই খচখচানি অনুভূতিটাকে মনের মধ্যে পেলে-পুষে রাখছেন।

এতে ঘটনাটা কী ঘটে? আপনি সবই করেন কিন্তু কোনো কিছুতেই প্রাণ থাকে না। সব কাজই বোঝা মনে হয়। সংসারের কাজকে তখন ভালোবাসা যায় না। অল্প কাজেই ক্লান্তি চলে আসে। স্বামীর আনুগত্য, শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত, দেবর-ননদকে ভালোবাসা, সন্তানের যত্ন-আত্তি, সবমিলিয়ে হিমশিম খাওয়া অবস্থা তৈরি হয়। কাজকে তখন নিছক কাজই মনে হয়, কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তখন আনন্দ করার জন্য আবার ঘটা করে কক্সবাজার সি-বিচে গিয়ে বসে থাকতে হয়।

অনেক সময় শাশুড়ি-মায়েরও ওই রকম মনে হতে পারে। আমাদের বউটা এ রকম না হয়ে ওই-রকম হলে ভালো হতো; একটু মনে হয় ঠকেই গেলাম। মনের মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি তৈরি হলে কীভাবে খোলা মনে ভালোবাসা যায়?

এ ধরনের অনুভূতিগুলো তখন আসতে পারে যখন সম্পর্কে কৃতজ্ঞতার অনুশীলন উঠে যায়।

বউ-মা এবং শাশুড়ি-মা উভয়ের যৌথ একটি পদক্ষেপ–একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, যা আমাদের নিজেদের ভালো থাকা ও অন্যদের ভালো রাখার একটি সহজ হাতিয়ার। এ বৈশিষ্ট্যটি খুবই সহজলভ্য এবং আমাদের নাগালের ভেতরেই।

এই পদক্ষেপটাও শাশুড়ি বা বউ-মার জন্য খাস কোনো পদক্ষেপ না। আমাদের সবার ভালো থাকার জন্যই কৃতজ্ঞ থাকাটা খুব জরুরি। স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার একটি চমৎকার পথ।

দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে গুণটিকে ব্যাখ্যা করা হবে। আধুনিক গবেষণার আলোকে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন-হাদীসের আলোকে।

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো কৃতজ্ঞতা। এ সম্পর্কিত শত শত গবেষণা আছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে পজিটিভ সাইকোলজির কেন্দ্রবিন্দুতে যে বৈশিষ্ট্যটি আলোকিত হয়ে আছে সেটাই কৃতজ্ঞতা। এগুলো অনুশীলনের অসংখ্য উপকারিতা আছে।

অ্যামি কোলেটের মতে, কৃতজ্ঞতা সুখে থাকার একটি শক্তিশালী ক্যাটালিস্ট। এটা সেই স্ফুলিঙ্গ যেটা আপনার অন্তরের মধ্যে আনন্দের আগুন জ্বালায়।

মেলোডি বিটির মতে, কৃতজ্ঞতা আমাদের যা আছে সেগুলোকে যথেষ্ট করে। সাথে সাথে জীবনের অপরিণত বিষয়গুলোকে পরিণত করে। এটি অস্বীকৃতিকে গ্রহণযোগ্যতায়, বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলায় এবং বিভ্রান্তিকে স্বচ্ছতায় পরিণত করে। অতীতকে বুঝতে সাহায্য করে, আজকের জন্য শান্তি নিয়ে আসে এবং আগামীকালের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

গবেষণাগুলো বলে, কৃতজ্ঞ মানুষজন অন্যান্যদের তুলনায় তুলনামূলক বেশি হাসিখুশি এবং কম বিষণ্ণতায় ভোগে। এ কারণে হয়তো বিষণ্ণতার চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম যে পয়েন্ট নিয়ে রোগীকে চিন্তা করতে বলেন, সেটাও ওই কৃতজ্ঞতা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, একটি কৃতজ্ঞতার উপলব্ধি তাৎক্ষণিকভাবে ১০ শতাংশ সুখ বাড়িয়ে তোলে এবং ৩৫ শতাংশ হতাশা হ্রাস করে।

হয়তো এ কারণেই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি যখন মনের মধ্যে জায়গা শুরু করে তখন হিংসা-বিদ্বেষ-রেষারেষি ইত্যাদি আবেগগুলো সেখানে তেমন একটা জায়গা করতে পারে না। আনন্দ-উৎসাহ-সহানুভূতি বেড়ে যায়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যারা বেশি কৃতজ্ঞ থাকে তাদের মস্তিষ্কের মিডিয়াল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স বেশি সক্রিয় থাকে। মেডিয়াল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স যেকোনো কিছু শেখা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে জড়িত। মস্তিষ্কের এই সক্রিয়তা এক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কৃতজ্ঞতা এভাবে মস্তিষ্কের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তৈরি করে।

আরেকটি গবেষণায় পাওয়া যায়, কৃতজ্ঞতা মানুষকে ভালোর দিকে অনুপ্রাণিত করে; এর হাত ধরেই সে আত্মোন্নয়নের পথে হাঁটে। এটা অনেকটা এভাবে কাজ করে, যখন আমরা কৃতজ্ঞ থাকি তখন মানসিক প্রশান্তির কারণে নিজেদের

যোগ্যতা বাড়ানোর দিকে নজর দেয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি পাই। সাথে সাথে সহমর্মী হয়ে চিন্তা করার মতো সুযোগ আসে। নতুবা নিজের অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তিতে যে মানসিক কষ্ট হয়, সে কষ্টের ধকল সামলাতেই তো সব শক্তি শেষ হয়ে যায়। আমাদের আবেগ থেকে খারাপ অনুভূতিগুলো পরাভূত হলে শরীরে আপনা-আপনিই শক্তি চলে আসে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়ে যায়। শরীরের মধ্যে টক্সিক সিস্টেম grow করে। অপরদিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় মনের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম, ব্যথা-বেদনার উপশম, সঠিক রক্তচাপ এবং গভীর ঘুমের সাথে কৃতজ্ঞতার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়াটন স্কুলের গবেষকরা দেখেছেন, যেসব পরিচালকরা খুব সচেতনতার সাথে সক্রিয়ভাবে কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেতেন, তাদের কর্মচারীরা অন্যান্যদের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি দক্ষ ছিলেন।

কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ক্ষমা করার যোগ্যতা বাড়ে। একে অন্যের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার অনুভূতি তৈরি হয়। যে প্রতিষ্ঠানে বা অফিসে, পরিবারে বা গোষ্ঠীতে কৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বেশি, সেখানে একে অপরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তৈরি হয়। ফ্রেডরিকসনের রিসার্চ থেকে জানা যায়, কৃতজ্ঞতা পারস্পরিক সম্পর্ককে বৃদ্ধি করে।

মনোবিজ্ঞানী অ্যাডাম ব্র্যান্ড এবং ফ্রান্সেস্কো গ্রিনোর গবেষণায় দেখা গেছে, ভালো পারফরমেন্সের কারণে ধন্যবাদ পাওয়া টিম মেম্বারদের মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস খুব দৃঢ় থাকে।

Gratitude এর ওপর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সাইন্টিফিক এক্সপার্ট রবার্ট ইমনসের মতে, জীবনকে অর্থপূর্ণ ও বেঁচে থাকার যোগ্য করে তুলতে যেসব অনুভূতি প্রয়োজন, তা আসে কৃতজ্ঞতার অনুশীলন থেকে।

কৃতজ্ঞতা হলো একটি সচেতন ইতিবাচক আবেগ। বাস্তব, অবাস্তব, আধ্যাত্মিক, জাগতিক সবকিছুর জন্যই কৃতজ্ঞতা অনুভব করা যায়। কৃতজ্ঞতা একটি অনুভূতিও। এটা জন্মগত কোনো দক্ষতা বা প্রাপ্তি না। অন্যান্য সব গুণের মতো এই গুণটিও নার্সিং করে শক্তিশালী করা যায়।

সাধারণত কারও কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়ার পর তার এই ভালো অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা জাযাকাল্লাহ বা ধন্যবাদ জানাই।

প্রতিদিন আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ভালো ঘটনাগুলোর জন্যও আমরা ধন্যবাদ জানাই। ছোটবেলা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সামাজিক নিয়মের অংশ হিসেবে এই আচরণটা আমরা শিখি।

দিনের মধ্যে হয়তো অনেকবার ধন্যবাদ দিয়েছি, কিন্তু একবারের জন্যও কোনো আবেগ অনুভব করিনি। কৃতজ্ঞতা অনুভব করে হাসিমাখা মুখে সময় নিয়ে কয়জনকে ধন্যবাদ দিই? এ রকম ঘটে নাকি আমাদের সাথে? অনেকটা অসচেতন, অনুভূতিহীন ধন্যবাদ? মুখে বলা এই শব্দটাকে আরও আন্তরিকভাবে অনুভব করা যায় কি না?

হ্যাঁ, আমরা অনেক ব্যস্ত। ব্যস্ততার জীবনের নানামুখী চাপের মধ্যে কারও প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করা, সময় নিয়ে সচেতনভাবে তা প্রকাশ করা চাট্টিখানি কথা না। রুটিন করে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে কয়জন পারে? তবে এও ঠিক, আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় আশেপাশের বিভিন্ন সমস্যার ওপর ফোকাস করে শরীর-মনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তার মানে এই না, যে বিষয়গুলো রীতিমতো ঠিকঠাক চলছে সেগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন হলো, আপনি কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্র্যাক্টিস করতে পারেন? এ ক্ষেত্রেও নানাজনের নানা মত আছে, নানা পদ্ধতি আছে। যেমন ধরুন :

- প্রতিদিন কিছু সময় নিয়ে বর্তমানে আমাদের জীবনের ভালো সব বিষয়গুলোকে কল্পনায় দেখতে উৎসাহিত করেছেন। একবারের জন্য হলেও যদি আমরা আমাদের বর্তমানের সৌন্দর্যমণ্ডিত দিকগুলোকে খুঁজে বের করতে পারি, তখন আশেপাশের ভালো দিকগুলোও খুঁজে পাওয়া, স্বীকার করা, অনুভব করা সহজ হয়ে যায়। আমাদের ছোট জীবনে অন্যান্যদের ভূমিকা, অবদানগুলো তখন পরিষ্কার দেখা যায়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব একে অপরের সাথে আমরা কতটা আন্তঃনির্ভরশীল, সেটা তখন বুঝে আসে।

- প্রতিদিন অন্তত পক্ষে তিনটি জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করুন, যার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। এই চিন্তাটাকে দৈনন্দিন কাজের একটি অংশ মনে করলে, আস্তে আস্তে এই চিন্তাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতে মেজাজ-মর্জি ভালো থাকবে, ঘুমের গুণগত মান বেড়ে যাবে। সব সময় প্র্যাকটিস করে কৃতজ্ঞতার আবেগকে অভ্যাসে পরিণত করা সম্ভব হলে জীবনের জোয়ার হয়তো ঘুরে যেত।

  থেরাপিস্টরা বিষণ্ণতার চিকিৎসার শুরুতে যে ব্যায়ামটি করতে পরামর্শ দেন তা হলো, কৃতজ্ঞ চিন্তার চর্চা। উনারা সাধারণত ব্যায়ামটা এভাবে করতে বলেন, ১০ মিনিট ধরে ভালো দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করে সেটাকে লিখে ফেলতে হবে। এটা অনেকটা গ্রাটিটিউড জার্নালের মতো। এতে আপনি যা কিছু পেয়েছেন, যা কিছু উপভোগ করেছেন বা করছেন, সব অনুগ্রহ, সুযোগ-সুবিধা, ভালো ঘটনা, মূল্যবান ব্যক্তিদের সাথে কৃতজ্ঞতার মুহূর্তগুলো—সব থাকবে। এমনকি আপনার ব্যক্তিগত গুণাবলিও থাকবে। সাত দিন পরপর আগের সব লেখাগুলো পড়তে হবে। এতে হতাশার উপকরণগুলো ভুলে ভালো থাকার উপকরণগুলোকে সহজে আঁকড়ে ধরা যায়। ড. রবার্ট এমনস এবং মাইকেল ই ম্যাককুলের গবেষণা অনুসারে, যারা প্রতি সপ্তাহে কৃতজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বাক্য লেখে, তারা জীবন নিয়ে খুব আশাবাদী থাকে।

- প্রতি সপ্তাহে নতুন একজনকে ধন্যবাদ দেয়া যায় কি না! ন্যূনতম একজন হলেও। নতুন একজন করে যদি ধন্যবাদ দেয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ানো যায়, তবে আপনার চারপাশে কৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বাড়বে। তবে ধন্যবাদকে একটু সচেতনতার সাথে অর্থপূর্ণ ও প্রাণবন্ত করা যায় কি না? সচেতন আবেগ, চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার ঝিলিক, মুখে হাসি, কণ্ঠে ধন্যবাদ।

- সবার জীবনেই দুর্দিন আসে, কঠিন সময় আসে। আবার চলে যায়। জীবনের ভালো সময়ে দাঁড়িয়ে পার করে আসা দুর্দশাগুলো মনে করে কৃতজ্ঞতা অনুভব করা যায়। তখন আপনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, জীবন কত কঠিন ছিল! কতদূর পার করে এসেছি! আপনার এই অনুভূতিটা কৃতজ্ঞতার জন্য কিছুটা হলেও উর্বর জমিন দেবে।

- সারাদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে কিছু সময় বের করে নিজেকে প্রশ্ন করতে

পারেন—আমি কী পেয়েছি? আমি কী দিয়েছি? আমি কী কী সমস্যা-অসুবিধা সৃষ্টি করেছি।

- আমাদের শরীরের মাঝে পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যা কিছু দিয়েছেন তার অলৌকিকত্ব অনুভব করে কৃতজ্ঞ হতে পারি। স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ আস্বাদন, শোনার ক্ষমতা, এত প্রতিকূলতার মাঝেও ঠিকঠাকমতো বেঁচে থাকা মহান মালিকের অবিশ্বাস্য উপহার। এই উপহারের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ হতে পারি।
- সমাজে যেসব মানুষকে আমরা কৃতজ্ঞ বলে জানি তাদের একটি বিশেষ ভাষাশৈলী আছে। কেউ উপকার পৌঁছালে তারা তাদের সেই বিশেষ প্রাচুর্যপূর্ণ ভাষাশৈলী ব্যবহার করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য কার ক্ষেত্রে কোন ভাষা প্রয়োগ করলে, শব্দচয়ন কেমন হলে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি আন্তরিক হয়, সেটা আপনি প্র্যাকটিস করে বের করতে পারেন। তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথায় আপনি কতটা ভালো অবদান রেখেছেন সেদিকে ফোকাস না করে অন্যরা আপনার জন্য যে ভালো বিষয়গুলো করেছে, সেদিকে ফোকাস করুন।

তবে মুসলিমদের জন্য এতশত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যুক্তি-প্রমাণ লাগে না। তাদের জন্য তো আল্লাহ তাআলার একটি হুকুমই যথেষ্ট। তাদের জন্য কুরআনের একটি আয়াতই যথেষ্ট। তাদের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকনির্দেশনাই যথেষ্ট।

কৃতজ্ঞতা আদায় শুধু ভদ্রতা বা শখের বিষয় না; বরং বাধ্যতামূলক একটি কাজ। এই গুণের প্র্যাকটিস না করলে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভয়ংকর আজাবের হুমকি।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো তবে তোমাদের আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৭৪]

৭৪. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৭

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

'আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো কেবল স্বীয় কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর সে অকৃতজ্ঞ হলে তো আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৭৫]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বিনিময়ে তাদেরকে তাঁর স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'[৭৬]

শাশুড়ি-মা ও পুত্রবধূ, একটু কষ্ট করে একবারের জন্য হলেও চেষ্টা করে দেখুন, একে অন্যের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞ হওয়া যায় কি না। দয়া করে বলবেন না, আমার বউ-মা বা শাশুড়ি-মায়ের মধ্যে কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য তো খুঁজে পাওয়া যায় না। কারও মধ্যে কৃতজ্ঞ হবার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে রাখবেন কেন?

৭৫. সূরা লুকমান, (৩১) : ১২

৭৬. সূরা বাকারা, (২) : ১৫২

শাশুড়ি-মায়ের প্রতি নিবেদন

এই পয়েন্টগুলো নিয়ে শাশুড়ি-মা একটু ভাবতে পারেন :

১. ছেলে কিন্তু আগের মতো থাকবে না!

'ছেলে আর আগের মতো নেই' অনেক মা ছেলেকে বিয়ে দেয়ার পরে এভাবে চিন্তা করেন। আবার অনেকে তো এই ভয়ে সময় হয়ে গেলেও ছেলের বিয়ে দিতে গড়িমসি করেন। মনের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক—ছেলে বুঝি আর আমার থাকল না। একজন মা যখন এভাবে চিন্তা করেন, তার তো বুকটা চিরে যাবার কথা।

কিন্তু সম্মানিতা মা, আপনি আরেকটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারেন। ছেলের বিয়ের পরও সে আগের মতোই থাকবে, এটা একটা ভুল প্রত্যাশা হয়ে যায় না? সে কীভাবে আগের মতো থাকবে? এখন তাকে নতুন একটি নারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়, নতুন আরেকটি পরিবারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। স্ত্রীর হক আদায়ে সচেষ্ট থাকতে হয়। পরিবারে যখন সন্তান আসে, সেই সন্তানের অভিভাবকত্ব করতে হয়। নতুন নতুন অনেকগুলো সম্পর্কের সাথে বোঝাপড়া করতে হয়। বাস্তবিকই, সে তো আর আগের মতো নেই। হাজারো দায়িত্ব তার কাঁধে।

এটা তো আনন্দের একটা বিষয় যে, আপনার ছেলে একটি মেয়ের দায়িত্ব নিতে শিখেছে। এ তো গর্ব করার মতো বিষয় যে, আমার ছেলে আরও একটি পরিবারের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারছে।

ছেলের এই পথচলায় আপনি একজন সাহায্যকারী হতে পারেন। বিবাহিত জীবনে ছেলের পদক্ষেপকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আপনার উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা নিঃসন্দেহে আপনার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার।

ছেলের সংসার আনন্দঘন করতে আপনার যেকোনো পদক্ষেপ আপনাদের মা-ছেলের সম্পর্ককে আরও আন্তরিক করবে। অনেক মা দূর থেকে দাঁড়িয়ে ভাবেন, 'দেখি ছেলে কী করে!' মনে মনে চিন্তা করেন, বউ বসতে বললে বসে, উঠতে বললে ওঠে!

এসবে লাভ কী? এসব চিন্তায় না আপনার কোনো লাভ আছে, না আপনার ছেলের।

আপনি আগে যেভাবে ছেলের সাথে আচরণ করতেন, এখনো সেভাবেই করবেন। এটা আপনার মা-ছেলের চিরায়িত সম্পর্কের স্বাভাবিকতা। এই স্বাভাবিকতা নষ্ট করার অধিকার কেন অন্য কাউকে দেবেন? কেন মনে করবেন, একটি মেয়ে এসে দু-দিনেই মা-ছেলের বন্ধন ছিন্ন করে করে ফেলবে। অসম্ভব! বরং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, উৎসাহ,অনুপ্রেরণার ফলে আপনার পুত্র-সন্তানের সাথে আরও একটি সন্তান (পুত্রবধূ) আপনার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে।

তবে মায়ের কাছে ছেলের বা ছেলের কাছে মায়ের অনেক আরজি, আবেদন থাকে, টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপার থাকে। আমাদের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাস্তবতা এমনই। বিয়ের পর স্বামী হিসেবে বিভিন্ন আবদার পূরণ করতে হয়, সন্তানের পিতা হওয়ার পর পিতা হিসেবে বিভিন্ন আবদার পূরণ করতে হয়, মায়ের সন্তান হিসেবে বিভিন্ন আবদার পূরণ করতে হয়।

সম্মানিতা মা, বিভিন্ন আবদার পূরণের ক্ষেত্রে আপনি আপনার ছেলের সাথে নেগোসিয়েশন করে নিতে পারেন। সবাই তো অঢেল টাকা-পয়সার মালিক হয় না। কখনো স্ত্রী তার আবদার সেক্রিফাইস করবে, কখনো মা তার আবদার সেক্রিফাইস করবে, কখনো সন্তান তার আবদার সেক্রিফাইস করবে। এই সেক্রিফাইসের মানে এই না যে, তার গুরুত্ব কমে গেছে।

শ্রদ্ধেয় মা, আপনার ছেলের এই পর্যায়ে আসতে আপনার অনেক কষ্ট-কুরবানী আছে। আপনাদের বিচক্ষণতা, ধৈর্য, পরিশ্রম, আদর, শাসন সবকিছুকে সাথে নিয়ে আপনার ছেলে নতুন বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে। এটা আপনারই

একটা অর্জন। আপনার ছেলের মধ্যে একটু পরিবর্তন এসেছে, আসাটাই স্বাভাবিক। তবে পরিবর্তনটুকুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলে আপনারা 'মা-ছেলে' 'মা-ছেলেই' থাকবেন।

২. জড়িয়ে ধরার সময় এত চাপ দেবেন না, যে বউ-মার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়

অনেক শাশুড়ি-মা আছেন, আদরের আদলে বউ-মাকে এত বেশি নির্দেশনা দেন যে, বউ-মার মতামত প্রকাশের কোনো জায়গাই থাকে না। এমনকি অনেকে তো বউ-মা কোন কাপড়চোপড় পরবে সেটাও বলে দেয়, বাচ্চাকে কোন জামাকাপড় পরানো হবে সেটাও বলে দেয়। 'হয়তো পারবে না, পারলেও হবে না' এ আশঙ্কায় মায়েরা সবকিছু বলে দেন।

'সবকিছু তোমার ভালোর জন্যই করছি। শেখো শেখো, কাজে লাগবে; ওখানে যেয়ো না, এর সাথে কথা বোলো না, ওর সাথে কখনো মিশবে না।'

নিঃসন্দেহে শাশুড়িরা ভালোর জন্যই বলেন। তবে ভালো করতে গিয়ে যেন হিতে বিপরীত না হয়। আদর করার সঠিক উপায়টা তো আপনাকে খেয়াল করতে হবে। জেনারেশন গ্যাপকে মাথায় রাখতে হবে। আপনার রুচি, পছন্দ, আদর্শ অনেক সময়ই আপনার চেয়ে ২০, ২৫ বছরের ছোট বউ-মার মতো হবে না। কিছু মতের অমিল তো থাকতেই পারে।

তার রেসপনসিবিলিটির জায়গাগুলো আপনি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বউ-মাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারলে তো আপনি একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে বলে বলে করানোর চেয়ে আপনি তাকে দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে রাখতে পারেন। একটু ভুল করে, হোঁচট খেয়ে, ভেঙে-গড়ে আপনার চোখের সামনে আপনার জীবদ্দশাতেই আপনার বউ-মা ঘরকন্নার কাজগুলো শিখে গেল।

আপনার ছেলের চিরদিনের সঙ্গীকে সারাদিন নির্দেশনার মাঝে না রেখে উনাকেও একটি স্পেস দিলেন।

৩. উপদেশের ঝরনাধারা থেকে বিরত থাকা

উপদেশ চাওয়ার আগেই উপদেশ দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

অনেক শাশুড়ি-মা সাবানের বুদ্‌বুদের মতো উপদেশ ছাড়েন। উপদেশের যেন বন্যা বয়ে যায়। দেখা গেল, বউ-মা আপনার কাছে উপদেশ চাচ্ছে না, কিন্তু আপনি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই উপদেশের গ্রহণযোগ্যতা কেমন হবে?

অনেক শাশুড়ি-মায়ের তো উপদেশগুলো নিছক উপদেশই থাকে না, এর ফাঁকে ফাঁকে থাকে অসংখ্য খোঁচাখুঁচি, বাঁকা কথা, কটুকথা। এমনকি অনেকে উপদেশ দেয়ার সময় সুনির্দিষ্টভাবেও কিছু বলেন না। বউ-মা ডানে গেলে চিল্লাচিল্লি শুরু করেন, কেন ডানে গেলে! বউ-মা বামে গেলে চিল্লাচিল্লি শুরু করেন, কেন বামে গেলে! কিন্তু পরিষ্কার করে বলেন না–বামে যাও বা ডানে যাও। অনেকে ধরে নেন, সব বলে দিতে হবে কেন?

অনেক শাশুড়ি-মা মোটাদাগে বলেন, আমি যেভাবে সংসার করেছি তুমিও সেভাবেই করবে। এটা মেনে চলবে, এটা মেনে চলবে; বউ মানুষ এটা করতে হয়, না করলে লোকে কী বলে!

তবে এভাবে উপদেশ দিলে সেই উপদেশ থেকে ফিল্টার করে করণীয় কাজগুলো আলাদা করতে সব বউ পারে না। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না পেলে অনেকেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তাই নির্দেশনা দেয়ার সময় পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং জিহ্বার নরম সিফাতের স্মরণ অন্তত থাকা উচিত।

আরেকটি কথা, উপদেশ দেয়ার আগে পাত্র তৈরি করে তারপর উপদেশ দিলে আপনার কথার ভার থাকবে।

আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, আমার শাশুড়ির কাছে বউ-মা হিসেবে আমি যেমন ছিলাম আমার বউ-মাও সে রকমই হোক?

কোনো শাশুড়ি-মা যদি এভাবে বলতে পারেন, উনার শাশুড়ির জন্য উনি যা করেছেন তার বউ-মাও তার জন্য তা-ই করুক, তবে নিঃসন্দেহে উনি খুব চমৎকার উপায়ে তার বউ-মাকে শেখাতে পারবেন। আর তার শেখানোর মধ্যে বউ-মা একধরনের প্রভাব অনুভব করবে। কারণ সেই শাশুড়ি-মা ইতিমধ্যে জানেন, কীভাবে সুন্দরভাবে বউ-মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

আপনি কীভাবে আপনার শ্বশুড়বাড়ির মানুষকে সম্মান করেন, এটা দেখে আপনার বউ-মা উপলব্ধি করতে পারবে আপনি কেমন বউ-মা চান। আপনি যেমন বউ-মা চান আপনি তেমন হয়ে দেখান। আপনার উপদেশবাণী শুনে আপনার বউ-মা হয়তো বদলাবে না, কিন্তু আপনাকে দেখে সহজে বদলে যাবে। আপনি হয়ে যেতে পারেন আপনার বউ-মার জন্য একজন আদর্শ বউ-মার রোল মডেল।

সম্মানিতা শাশুড়ি-মা, হয়তো আপনার শাশুড়ি-মা দুনিয়াতে নাও থাকতে পারেন, কিন্তু তার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা, সম্মান বা অনুভূতি কেমন সেটা কাছের মানুষেরা সহজেই আঁচ করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় মা, একটু সময় নিয়ে চিন্তা করুন, আপনি বউ-মা হিসেবে কেমন ছিলেন আর আপনি ঠিক কেমন বউ-মা চান?

৪. তাড়াহুড়া করা

সংসার সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক, সে তুলনায় আপনার বউ-মা একেবারেই আনাড়ি। রান্না করতে পারে না, কাজ বোঝে না, কীভাবে মিলেমিশে থাকতে হয় সেটাও জানে না, অনেক সমস্যা। বউ-মার এমন অযোগ্যতা দেখে শাশুড়ি মনে করেন, এই মেয়ে সংসারের হাল ধরলে না জানি সংসারের কী অবস্থা হবে? সব তো উচ্ছন্নে যাবে। তাই অনেকে সংসারের হাল মজবুত করে ধরতে বা বউ-মাকে সংসারের জন্য যোগ্য করার মিশনে উঠেপড়ে লাগেন। খুব তাড়াহুড়া করেন।

সব বউ-মা এই তাড়াহুড়াটা মেনে নিতে পারে না। বিরক্ত হয়, ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। আবার আপনার গতির সাথে যদি বউ-মা তাল মিলাতে না পারে, তবে আপনিও বিরক্ত হবেন, রেগে যাবেন। তখন আপনার জন্য শেখানোটা আরও কঠিন হয়ে যায়, সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়।

আবার বউ-মা যদি চেষ্টা করেও না পারে তখন তীব্র মানসিক চাপ অনুভব করবে। আর সে যদি ধৈর্য ধরতে ব্যর্থ হয়, তবে আপনাকে প্রতিপক্ষ ভাববে। আপনাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করবে অথবা আপনার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা

করবে। অনেকে তো আড়ালে গালিগালাজও করে, এমনকি শাশুড়ির মৃত্যুও কামনা করে (নাউযুবিল্লাহ)।

আপনার শেখানোর পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কয়জন শাশুড়ি বউকে শেখাতে চায়? নিঃসন্দেহে এদিক-ওদিক থেকে শেখার চেয়ে আপনার কাছে সংসার নামক বস্তুটা শিখে নেয়া বউ-মার জন্য বেশি নিরাপদ। অনেকটা বয়ঃসন্ধিতে বাচ্চাকে যৌনশিক্ষা দেয়ার জন্য বাবা-মা যেমন নিরাপদ, তেমনই বউ-মাকে সংসার শেখানোর জন্য শাশুড়ি নিরাপদ। সমস্ত ইগোকে একপাশে সরিয়ে আপনি যদি তাকে শেখানো শুরু করেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনার নাসীহা বৃথা যাবে না। বাতাসে মিশে যাবে না। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না।

২০-২৫ বছরের অভ্যাস কীভাবে দু-এক মাসের মধ্যে পরিবর্তন হবে? একটু সময় লাগবে। তবে বউ-মার ইচ্ছা-আগ্রহ থাকলে সে সহজেই নিজেকে সেভাবে সাজিয়ে নেবে।

এ কথা সত্যি, শাশুড়ি-মায়ের জীবন নিয়ে অভিজ্ঞতা বেশি; তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, দেখছেন। তার মানে এই না যে, তিনি শাশুড়ি হওয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ। এই প্লাটফর্মে তিনি নতুন। সারাজীবন অনেক শাশুড়িদের দেখা, গল্প শোনা আর নিজে সেটার মুখোমুখি হওয়া এক জিনিস না। শাশুড়ি হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করতে উনারও কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ তাআলা সব শাশুড়ি-মাকে বউ-মার জন্য অন্যরকম এক মাতৃছায়ায় পরিণত করুন। আমীন।

বউ-মার করণীয়

আপনি যদি বউ-মা এবং শাশুড়ি-মায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেন, তবে অধিকাংশ জায়গাতেই বউ-মার করণীয় কাজের লিস্ট অনেক বড় পাবেন। নির্দেশনা সব যেন তাদেরই জন্য! সে তুলনায় শাশুড়ি-মায়ের করণীয় সম্পর্কে তেমন কিছু মেলে না। এটা কি আসলে বিবাহিতাদের ওপর একমুখী কোনো চাওয়া? নাকি সম্পর্ক ভালো করার সব দায়িত্ব নববিবাহিতাদের কাঁধে?

কারণটা হয়তো এমন হতে পারে, বউ-মার সামনে এখনো অনেক সম্ভাবনা পড়ে আছে। জীবনটা সবে শুরু হয়েছে। শেখা-জানার অনেক কিছু আছে। এর সাথে সাথে আরও জোরালো একটি যুক্তি আছে। আর তা হলো, পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াটা বউ-মার জন্য তুলনামূলক সহজ।

আপনি তরুণী। আপনার রক্তে এমন কিছু আছে যা পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত বদলে যেতে পারে, মানিয়ে নিতে পারে। যেটা ৫০-৬০ পার হলে খুব একটা সম্ভব হয় না। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি পড়েছেন নিশ্চয়ই।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেয়া-নেয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

ঘাবড়ে যাবেন না নিশ্চয়ই। সত্যি বলতে কি, দিনশেষে আপনাকেই বেশি মানিয়ে চলতে হয়; কারণ আপনি 'করণীয়' বেশি করতে পারেন, আপনার শক্তি-সামর্থ্য বেশি।

আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগবে, কেন আমাকেই শুধু এগিয়ে যেতে হবে? সম্পর্কের জন্য আমাকেই কেন বারবার পদক্ষেপ নিতে হবে? সম্পর্ক ভালো রাখতে কেন আমিই শুধু দিয়ে যাব?

আপনি আসলে যা করছেন তা আপনার জন্যও না, আপনার শাশুড়ির জন্যও না, আপনার স্বামীর জন্যও না, আপনার সন্তানের জন্যও না, আপনার সব পদক্ষেপ এই সম্পর্কগুলোর জন্য। যাতে সম্পর্কটা ভালো হয়। অনেক সময় মনে হয়, আমি এটা করছি, এটা তো উনার করার কথা। আমি উনার জন্য এত করেছি, কিন্তু প্রতিদানে কী পেয়েছি? এসব প্রশ্ন, চিন্তা আমাদের ঘরের ভেতরের সম্পর্ক উন্নয়নে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে, এগিয়ে যেতে বাধা দেয় কি না?

তবে এও ঠিক, সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে সচেতনভাবে সব সময় সংসারের জন্য করে যাওয়া, প্রচেষ্টা করা মুখে বলা সহজ হলেও, কাজে পরিণত করা খুব একটা সহজ না। তারপরও সত্যি বলতে, এসব প্রচেষ্টা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে ভালো রাখে, নাকি রাগ, প্রতিশোধ ভেতরে পুষে রাখলে আপনি ভালো থাকেন? যে সম্পর্কটাকে আপনি বর্তমানে দাঁড়িয়ে থেকে অনুভব করছেন, সেই সম্পর্কটাকে ৪০ বছর পরের কোনো একদিনে দাঁড়িয়ে অনুভব করে দেখুন, আপনার ছোট ছোট পদক্ষেপ, প্রচেষ্টা বা কষ্ট-কুরবানী সম্পর্কটাকে কোন ধরনের উপসংহার দিয়েছে। আপনাদের সম্পর্কের ইতিহাসটা বিলাসবহুল করতে আপনার অবদান কোন পর্যায়ের? একটু নিরপেক্ষ চিন্তা করে দেখুন, কী করলে আসলে আপনি ভালো থাকেন?

মনে করুন, সম্পর্ক একটি মাটির ব্যাংক। আপনি যখন এই সম্পর্ক উন্নয়নের

লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ নেন, তার মানে মাটির ব্যাংকে আপনি যেন একটি কয়েন রাখলেন। মাটির ব্যাংকে কয়েন রাখার কারণে সে যেমন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেয় না, তেমনই আপনার সাথে সম্পৃক্ত অনেকেই ভালো আচরণের কারণে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না, হয়তো বাহবা দেবে না; কিন্তু সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ধনী হতে থাকবে।

অনেক সময়ই আপনার কাজের ঠিক সমান সমান প্রতিক্রিয়া আপনি অন্যের কাছ থেকে নাও পেতে পারেন। হতাশ না হয়ে যদি এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে, আমি এই ছোট ভালো কাজটা করলাম শুধু সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে। ঘরের সম্পর্কগুলো সুন্দর করতে এ ধরনের চিন্তা কিছুটা হলেও সম্ভাবনা তৈরি করে।

পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন বা সম্পর্কগুলো এক হয়ে যাওয়া মানে সম্পৃক্ত মানুষজনের মতামত, আদর্শ, সংস্কৃতি, চলাচল, সব এক ছাঁচে গড়ে ওঠা না; বরং বিভিন্ন মতাদর্শ, দর্শন নিয়ে শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতিতে একে অন্যের জন্য হয়ে যাওয়া।

এ অংশে বিবাহিতার করণীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হবে, এ বিষয়গুলো আশা করি আপনার এই মানিয়ে নেয়ার কাজটাকে সহজ করবে।

১. কাকে গুরুত্ব দেব? কখন গুরুত্ব দেব?

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপনি শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। এখানে আপনার সবচেয়ে আপন কে? অর্থাৎ মৌলিক সম্পর্ক কার সাথে? আপনার স্বামী, ঠিক?

স্বামী যাদের সাথে যে স্তরের সম্পৃক্ত, তারা আপনার সেই স্তরের আপন। আপনার স্বামীর সাথে আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার সুবাদে আপনি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ, সম্পৃক্ত।

আল্লাহ না করুক, কোনো কারণে যদি আপনার স্বামীর সাথে আপনার ছাড়াছাড়ি হয়, তবে স্বামীর মাধ্যমে যাদের সাথে সম্পর্ক হয়েছিল, সব নাজুক বা বাতিল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আপনি আপনার শাশুড়ির খেদমত করেন স্বামীর সাথে আপনার সম্পর্ক সুন্দর করার জন্য। আপনি দেবর, ননদ নিয়ে মিলে থাকেন আপনাদের স্বামী-

স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর করার জন্য। মূল সম্পর্কের মান যথাযথ রেখে বাকি সম্পর্কের যত্ন নেয়া মোটাদাগে সব সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। অর্থাৎ অন্য সম্পর্কের জন্য শ্রম দিলেও তা হবে মূল সম্পর্ককে ভালো রাখার জন্য।

সম্পর্কের আপন-পর বুঝতে পারাটা খুবই জরুরি। তা না হলে বাবার চেয়ে বন্ধু আপন হয়ে যায়; স্বামীর চেয়ে দেবর বেশি আপন হয়ে যায়; শাশুড়ির চেয়ে চাচি শাশুড়ি, খালা শাশুড়ি বেশি আপন হয়ে যায়।

আপনি যখন আপন-পর বুঝে আপনার কাজগুলো সাজাতে থাকবেন, তখন আপনার স্বামীর আপনার সাথে সম্পর্ক তুলনামূলক ভালো হতে থাকবে। কারণ, তখন আপনি শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যের হক আদায় করবেন স্বামীর সাথে আপনার সম্পর্কের ভিত্তিতে। যেমন ধরুন, কেউ যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তাআলার অন্যান্য সব সৃষ্টির হক আদায় করে, তবে তার সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক ভালো হতে থাকে।

শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য কারও সাথে এমন কোনো সম্পৃক্ততা রাখা ঠিক না যেখানে প্রধান সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হয়। আপনার স্বামী চান না আপনি অমুকের সাথে মেশেন, তাহলে আপনি কেন মিশবেন! আবার এই নতুন সম্পর্কের কারও সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে হয়তো আপনার শাশুড়ি চান না, তাহলে আপনার কী দরকার? আপনার শাশুড়ি বা আপনার স্বামী উনাদের পরিবারের অন্যান্যদের সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি জানেন। তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করা আপনার জন্য বেশি নিরাপদ। মোটকথা, আপনি অন্যান্য সকল সম্পর্কের যত্ন নেবেন প্রধান সম্পর্কের যত্নের স্বার্থে।

ধরুন, সবার সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো হলো, কিন্তু স্বামীর সাথেই টানাপড়েন। তাহলে আপনার এই ভারসাম্যহীন সম্পৃক্ততা আপনাকে কতদিন ভালো রাখবে?

আর সত্যি বলতে কি, একসাথে দুই-তিন জনকে খুশি করা, মন জয় করা তুলনামূলক কঠিন, কখনো কখনো অসম্ভব। কারও অফিসে যদি একাধিক বস থাকে, তাহলে কর্মচারীদের কী দুর্ভোগটাই-না হয়! অবস্থা অনেকটা ফুটবল খেলার ফুটবলের মতো হয়ে যায়। একজন একদিক থেকে কিক করে, আরেকজন আরেক দিক থেকে।

এ ধরনের দুর্ভোগ থেকে আমাদের বাঁচাতে আল্লাহ তাআলা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সূরা যুমার-এ বলেছেন,

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا

'আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের পরস্পর-বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আর আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন, তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান?'[৭৭]

যদিও আমাদের সমাজে একটা কথা বহুল-প্রচলিত আছে যে, বিয়ে একজন মানুষের সাথে না; বরং একটি পরিবারের সাথে হয়। একজন মানুষের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে স্বামী-স্ত্রী যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সে পরিবারের সবার যদি মন জয় করতে হয়, আমি যা না তা-ই করতে হয়, তবে সেগুলো কষ্টকর। এসব ভুল ধারণা সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। একজন মানুষ তো সবার মন জয় করতে পারে না। আপনি যা না তা প্রমাণ করার তো দরকার নেই। আমাদের সবারই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতাগুলো আমরা বাস্তবে মেনে নিয়ে চলতে শিখি, ভেতরে চেষ্টা রাখি সীমাবদ্ধতাকে ওভারকাম করার।

সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যখন সংসারের জন্য, সম্পর্কের জন্য করা হয়, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়; তখন চিৎকার-চেঁচামেচি-চিল্লাচিল্লি শুরু হয়। সবাই অবাক হয়ে বলতে থাকে, সে তো এতদিন এমন ছিল না, সে এগুলো করে আসছে, আজকে কেন পারছে না? আপনার কষ্ট বা সীমাবদ্ধতাগুলো তখন কেউ দেখবে না; বরং সরাসরি দোষগুলো আবার আপনার ঘাড়ে চলে যাবে। সবাই ভাববে, ইচ্ছে করে আপনি এখন আর তাদের জন্য করছেন না।

বস্তুত সবার কাছে তো ভালো হওয়ার দরকার নেই। আর সবাই কখনো একসাথে আপনাকে ভালো বলবেও না। এ জন্য খেয়াল রাখা দরকার, নিজেরা কীভাবে ভালো থাকা যায়। নিজেরা বলতে মৌলিক সম্পর্কে সম্পৃক্তরা। এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। গবেষণায় দেখা যায়, মানুষ যখন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্ব না দেয় তখন তার অধঃপতন শুরু হয়।

৭৭. সূরা যুমার, (৩৯) : ২৯

সম্পর্কের গুরুত্ব মাথায় রেখে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে আপনি যখন আপনার কাজগুলো সাজাতে চাইবেন তখন প্রথমে আপনাকে আপনার কাজগুলো চিনতে হবে। কাজ কীভাবে চিনতে হয় সে সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

যেমন : প্রথমে সমস্ত কাজকে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়। জরুরি বলতে বোঝায় এখনই করতে হবে, আর গুরুত্বপূর্ণ বলতে বোঝায় কাজটা খুবই করা দরকার; কিন্তু এখনই করতে হবে এমন না, পরে করলেও হবে।

কিছু কাজ থাকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জরুরি না। আবার কিছু কাজ থাকে জরুরি, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ না। যেমন : টয়লেটে যাওয়া খুবই জরুরি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। আপনি নিজের জন্য একটি লিস্ট করে তৈরি করে ফেলতে পারেন—আপনার জন্য জরুরি কাজ কী কী এবং আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী কী।

জরুরি কাজ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রান্না করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো, পড়ানো, কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করা ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা, লক্ষ্যের পেছনে কাজ করা, সম্পর্ককে সুন্দর করা, আত্মোন্নয়ন ইত্যাদি। এই কাজগুলো আমাদের একে অন্যের থেকে আলাদা করে।

এর সাথে সাথে খুঁজে বের করতে হবে, কোন কাজগুলো জরুরিও না, গুরুত্বপূর্ণও না। এ ধরনের কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সবচেয়ে বেশি বাধা দেয়। যেমন ধরুন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্যাপ করতে থাকা। কোন দিক দিয়ে সময় চলে যাবে আপনি নিজেও টের পাবেন না। এই টাইম ওয়েস্টারগুলো শনাক্ত করে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিত্তিতে নিজের জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারলে জীবনে ভালো কাজের সংখ্যা বাড়ানো কিছুটা হলেও সম্ভব।

এখন দেখি, আমাদের মুসলিমদের জন্য পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম' এই কাজটাকে কীভাবে করেছে?

ইসলামী শরীয়ত প্রথমেই সমস্ত কাজকে জায়েয-নাজায়েয এর ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। গুরুত্ব অনুযায়ী সকল কাজকে ক্যাটাগরাইজ করে ফেলেছে। এমনকি দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যদি একসাথে সামনা-সামনি চলে আসে, তাহলে কোন কাজটাকে আগে করতে হবে, মানুষ যেন সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে সেই নির্দেশনাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে।

এমনকি সময় বা পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমলের গুরুত্ব যে পরিবর্তিত হয়, সেটাও ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। যেমন, ইসলামের মহিমান্বিত এই জীবনব্যবস্থায় নামাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল বলা হয়, কিন্তু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় না করে যিকিরকে উৎসাহিত করা হয়। আপনি অফিসে কাজ করছেন বা সংসারের কাজে খুব ব্যস্ত, নামাজের সময় হলে অফিস বা সংসারের কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আবার হায়েয-নেফাসের সময় নামাজ বা তিলাওয়াত না করে নিজের যত্ন, বাচ্চার যত্নকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

আবার সালাতের মধ্যেও এই গুরুত্ব শেখানো হয়। ফরজ নামাজের গুরুত্ব এক রকম, ওয়াজিবের গুরুত্ব আরেক রকম; সুন্নাত নফল নামাজের গুরুত্ব আরেক রকম। ছোট-বড় সব কাজের গুরুত্ব সময়, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে।

সংসারে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার জন্য কোন কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

সময়, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও গুরুত্ব হারাতে পারে। রমযানের সিয়াম পালন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। রমযানের রোজা রাখা বাধ্যতামূলক একটি আমল। ইসলামী দেশে রমযান মাসে কেউ যদি প্রকাশ্যে খাবার খায়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সুযোগও সরকারের আছে। কিন্তু সফরে এই সিয়ামের হুকুমকেও শিথিল করা হয়েছে।

সম্পর্ক ও সম্পর্কের ফলে কাজকে গুরুত্বের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে পারলে সংসারের সময়টা খুব ভালো কাটে।

২. স্বামীর আনুগত্য

আনুগত্য বলতে আমরা বুঝি, আপনি করে কথা বলা, সম্মান দিয়ে চলা। দেখা গেল, স্বামী আমার কোনো একটা কাজ পছন্দ করে না, আমি হরহামেশা সেটা করে যাচ্ছি; কিন্তু মুখে ওই যে 'আপনি' করে কথা বলছি, তার মানে আমি আনুগত্য করি। সামনে 'আপনি' করে বললেই হবে, পেছনে যদি 'তুই' করে কথা বলি বা গালিগালাজ করি বা বদনাম করি, তাতেও খুব একটা সমস্যা নেই। এই তো আমাদের আনুগত্যের ধরন!

এ যুগে যদি আপনি আনুগত্যের কোনো জীবন্ত নজির দেখতে চান, তবে কর্পোরেট দুনিয়ায় দেখতে পাবেন। মাল্টিন্যাশনাল কোনো কোম্পানির অফিসে গেলে আনুগত্যের সংজ্ঞাকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বসদের কীভাবে আনুগত্য করা হয়! আপনি অবাক হয়ে যাবেন, যে নারী স্বামীর কোনো হুকুম মানাকে সম্মানের হানিকর মনে করে, সেও কীভাবে বসের আনুগত্য করে। বস যদি বলে, আজ রাত দশটায় বাড়ি ফিরতে হবে, কাজ আছে। তবে খুব কম এমপ্লয়ি প্রশ্ন তোলে, কেন আপনি সন্ধ্যা ছয়টার পরে থাকতে বলছেন? বরং সবাই তাদের অন্যান্য সিডিউল ম্যানেজ করে বসের কথাকেই মেনে নেয়। এমনকি ডে-আউট, পিকনিক বা যেকোনো অনুষ্ঠানে বস যদি কোনো গুনাহও করতে বলে, তবে সেখানেও অহরহ আনুগত্যের নজির মেলে। চিন্তা করা যায়, বসের কথার আনুগত্য করতে নর্তকীর সাথে নাচতেও রাজি হয়ে যায় নামাজী মুসলমান! হাতেগোনা দুয়েকজন ব্যতিক্রম থাকে, কিন্তু তারা আর ভালো এমপ্লয়ি হতে পারে না। কর্পোরেট জগতে অধিকার বা নিয়ম নিয়ে কথা হয় না, কথা হয় আনুগত্য নিয়ে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি শ্রম ও সময় দিয়ে সেখানে আনুগত্য করা হয়। যে বসের যত আনুগত্য করে, সে এমপ্লয়ি বসের তত প্রিয়।

রাজনীতির মাঠে বড় বড় নেতাদের মন কারা জয় করতে পারে? সেখানেও এই তালিকা যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় না; বরং আনুগত্যের ভিত্তিতে।

সামরিক শাসনেও আপনি আনুগত্যের নজির দেখতে পাবেন। কমান্ডার সেনাদেরকে যেভাবে হুকুম করে, তারা ঠিক সেইভাবে পালন করে। যদি বলে গুলি করতে, তো কোনো প্রশ্ন না করে সরাসরি গুলি করে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গেলে দেখা যায়, উচ্চ পদের কাউকে কীভাবে সবাই সম্মান করে, মানে। হিটলারের সেনাবাহিনীর মধ্যেও আনুগত্যের নজির আছে। একবার কোনো

একটা পাহাড়ের ওপর সৈন্যদের মার্চ করানো হচ্ছিল। এমন সময় কমান্ডার Go বলেছে, কিন্তু Stop বলেনি। পাহাড়ের ধারে চলে এসেছে, কিন্তু তারপরও সৈন্যরা মার্চ করা স্টপ করেনি। পাহাড় থেকে নিচে পড়ে অনেক সৈন্য তখন মারা যায়। হিটলার তার এই সেনাবাহিনী নিয়ে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখত।

যে দলে আনুগত্য থাকে সে দল শক্তিশালী হয়ে যায়। আমাদের পূর্বপুরুষ সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও এই গুণের এত অনুশীলন ছিল যে, তাদের দেখে কাফের মুশরিকরা ভয়ে কেঁপে উঠত, এই ভয় বদরের যুদ্ধের পর থেকে শুরু হয়নি; বরং এর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

আনুগত্যের অনেক পর্যায় আছে। স্বামীর হুকুম মানা একটা পর্যায়, স্বামী যা পছন্দ করে সেটা করা আরেকটা পর্যায়; স্বামীর পছন্দনীয় কাজ করা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকা একটি পর্যায়, স্বামীর মাইন্ডসেট বা মেজাজ, চিন্তাধারা বা বিশ্বাসকে বুঝে চলা আরেকটি পর্যায়।

স্ত্রী যখন এ বিষয়টি পারে, তখন মুখ দেখেই মনের কথাগুলো বুঝে যাওয়া যায়। স্বামীর চিন্তার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করা যায়। তখন স্বামীর সুখ-দুঃখের প্রকৃত ভাগী হওয়া যায়। কম্প্রোমাইজ এর অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়া যায়। হাতে হাত রেখে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পেছনে ছুটে চলা যায়।

দীর্ঘমেয়াদে ভালো একটি সম্পর্ক তৈরি করতে আনুগত্য লাগে। এটাই প্রকৃত খেদমত, এটাই আরাম পৌঁছানো। এর মাধ্যমে স্ত্রী হয় স্বামীর নির্ভরতার জায়গা। স্বামীর চোখের শীতলতা। কোনো স্বামী যখন বলেন আমার স্ত্রী খুব ভালো, এর মানে এই না যে, তার স্ত্রীর যোগ্যতা অনেক বেশি; বরং সে অত্যন্ত অনুগত। স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআনে কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বহু দিকনির্দেশনা আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন,

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

'কোনো মুমিনের জন্য আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের পর নেককার স্ত্রীর চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। কারণ স্বামী তাকে আদেশ করলে সে আনুগত্য করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে (স্বামী) মুগ্ধ হয়। তাকে নিয়ে শপথ করলে সে তা (শপথকৃত কর্ম) পূরণ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে (অন্যায়-অপকর্ম থেকে) এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে।'[৭৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসার মধ্যে বলেছেন, 'فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ' 'সতীসাধ্বী নারীগণ অনুগতা।'[৭৯]

হযরত হুসাইন ইবনু মুহসিন থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে কেমন আচরণ করে থাকো? তিনি বললেন, আমি একেবারে অপারগ না হলে তার সেবা ও আনুগত্যে ত্রুটি করি না।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে তোমার আচরণ কেমন তা ভেবে দেখো। কারণ, স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।'[৮০]

হযরত আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযি. বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমযান মাসের রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে, তাকে বলা হবে, তুমি যে দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ করো।' [৮১]

---

৭৮. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং ১৮৫৭। হাসান গরীব।

৭৯. সূরা নিসা, (৪) : ৩৪

৮০. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৯০০৩। হাসান।

৮১. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৬৬১। হাসান লিগায়রিহি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

'আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হলো নারী।'[৮২]

এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ও তাদের স্বামীদের প্রতি তাদের আনুগত্যের মাত্রা হলো অত্যন্ত কম; এবং তারা অধিক পরিমাণে তাবাররুজ (খোলামেলা অবাধ মেলামেশা) করে থাকে। তাবাররুজ করার মানে হলো নারীদের বাইরে যাবার উদ্দেশ্যে গৌরবমণ্ডিত দামি পোশাক পরিধান করা, সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জা গ্রহণ করা, প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করা এবং অন্যদের আকর্ষিত করার জন্য বেরিয়ে পড়া। যদিও সে নিরাপদে ফিরে আসে, কিন্তু সে মানুষকে নিরাপদে থাকতে দেয় না।

আওফ আশ-শায়বানী রহ.-এর মেয়ের বিয়ে হলে স্বামীর হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার মুহূর্তে মা উমামা বিনতে হারেস রহ. মেয়েকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন,

'মেয়ে আমার, যে ঘরে তুমি বেড়ে উঠেছ, খুশি ও আনন্দে যাকে ভরে রেখেছ, সে ঘর ছেড়ে অপরিচিত ঘরে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে তুমি যাচ্ছ। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কয়টি নসীহত মনে রেখো। এগুলো তোমার সুখী দাম্পত্য-জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (তার অনেক নসীহতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নসীহত ছিল) সে তোমাকে কোনো আদেশ করলে কখনো তা অমান্য করবে না। এবং তার ব্যক্তিগত কোনো কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। মনে রাখবে, নিজের চাওয়া ও চাহিদার ওপর স্বামীর চাওয়া ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত তুমি কখনো তার মন জয় করতে পারবে না। তুমি যদি তার দাসী হও, তাহলে সে তোমার দাস হবে।'[৮৩]

মুসলিমাদের জন্য এই দিকনির্দেশনাগুলোর ওপরে আর কোনো অনুপ্রেরণা নেই। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তবে এটাও ঠিক, সব স্বামী এক রকম হয় না; কেউ কেউ থাকে অস্বাভাবিক

---

৮২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৭

৮৩. আবু হাতিম সাজিসতানী (মৃত্যু ২৪৮ হি.); আল-মুআমমারূনা ওয়াল ওয়াসায়া, ৩৬-৩৭। (মাসিক আল কাউসার হতে গৃহীত)

বিকৃত রুচির, ঘরে তার আচরণ পশুর চেয়ে কোনো অংশে কম না। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের স্বামীদের থেকে নারীদের হেফাজত করুন। এসব জালিম স্বামীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার নারীরা তাদের সমস্যা নিয়ে কোনো হক্কানী মুরুব্বির সাথে আলোচনা করতে পারেন বা কোনো মেন্টর বা কাউন্সিলরের সাথে কথা বলতে পারেন। ভেঙে পড়বেন না, সাহস হারাবেন না। আপনার সমস্যা সমাধানের পথ আপনাকেই বের করতে হবে। কিন্তু সাধারণভাবে স্বামীগণ নারীদের জন্য অভিভাবক। তবে সে যদি আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানীসূচক কোনো কাজে হুকুম করে, তবে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

'আল্লাহর নাফরমানীতে কোনো আনুগত্য হতে পারে না। আনুগত্য শুধুই ন্যায়সংগত বিষয়ে।'[৮৪]

এখন আপনার মনে হতে পারে, এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো হবে। বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক ভালো করতে এগুলো কীভাবে সহায়ক?

সহায়ক হবে। পরিবারের মধ্যে যেকোনো একটা ভালো সম্পর্ক আরও একটি সম্পর্ককে ভালো হতে প্রভাবিত করে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর, বাবা-মার সাথে সন্তানের সম্পর্ক সুন্দর হয়, শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক সুন্দর হয়। তবে এটা ঠিক, অনেক শাশুড়ি আছে ছেলে-বউয়ের সুন্দর সম্পর্ক সহ্যই করতে পারে না! যদি শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক ভালো নাও হয়, তারপরও আপনি আঁকড়ে ধরে বাঁচার একটা শক্ত অবলম্বন নিশ্চয়ই পাবেন। আপনার স্বামীকে আপনার পাশে পাবেন। এটাই-বা কম কিসে?

সবশেষে দুজন মহীয়সী নারীর আনুগত্যের ছোট্ট দুটি নজির দিয়ে আনুগত্যের পয়েন্টটা সম্পন্ন করতে চাই। তাঁদের মধ্যে একজন আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। অপরজন দ্বিতীয় উমর খ্যাত খলীফা উমর ইবনু আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহর স্ত্রী।

---

৮৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪০

উনাদের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত শুধু স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল তা না; বরং স্বামীর মৃত্যুর পরও মহীয়সী নারীগণ দেখিয়েছেন স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা।

হযরত আসমা বিনতু উমাইস রাযি. হযরত আবু বকর রাযি.-এর স্ত্রী। মৃত্যুর সময় আমীরুল মুমিনীন স্ত্রীকে ওসীয়ত করে বলেছিলেন, আমি ইনতিকাল করলে তুমিই আমাকে গোসল দেবে।

আসমা রাযি. সেদিন রোজা রেখেছিলেন। রোজা রেখে গোসল দেয়া ও মৃত্যু-পরবর্তী শোকপরিস্থিতি সামলানো কষ্ট হবে ভেবে আবু বকর রাযি. তাকে সে সময় রোজা ভাঙতে বলেছিলেন। কেমন যত্নবান স্বামী ছিলেন তিনি, মৃত্যুর সময়ও স্ত্রীর প্রতি খেয়াল কোনো অংশে কমেনি। আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের আদর্শ এমনই অসাধারণ।

আবু বকর রাযি. ইনতিকাল করলে তিনিই তাকে গোসল দেন। তবে মৃত্যু-পরবর্তী শোকের পরিবেশ ও বিভিন্ন ব্যস্ততায় রোজা ভাঙার কথা ভুলে যান।

আবু বকর রাযি.-এর দাফনের পর দিনের শেষে মনে পড়ে এ কথা। তখন দোদুল্যমান হয়ে পড়েন আসমা রাযি.। দিন প্রায় শেষ। ইফতারের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। একটু পড়েই আজান হবে। এ অল্প সময়ের জন্য রোজা ভেঙে ফেলবেন? কিন্তু রোজা না ভাঙলে তো স্বামীর কথাও মানা হবে না। স্বামীর আনুগত্য করা হবে না। তাই স্বামীর কথামতো দিন শেষ হয়ে এলেও রোজা ভেঙে ফেলেন তিনি।[৮৫]

কেমন ব্যক্তিত্ব! কেমন স্ত্রী! কেমন স্বামী!

পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সৌভাগ্যের অধিকারিণী আরেকজন নারী।

তার বাবাও ছিলেন খলীফা, স্বামীও ছিলেন খলীফা, চার ভাইও ছিলেন খলীফা। হযরত ফাতিমা বিনতু আবদুল মালিক বিন মারওয়ান।

তিনি উমর ইবনু আবদুল আযীযের স্ত্রী। তার চার ভাইও একের পর এক খলীফা হয়েছেন। পরম আদর-যত্নে লালিত-পালিত এ মহিলার বিয়েও হয়েছে মহা ধুমধামের সাথে। বাবা তৎকালীন খলীফা আবদুল মালিক সোনা-গয়না, হিরে-

৮৫. তবাকাতু ইবনি সাআদ, ৮/২৮৪। (মাসিক আল কাউসার হতে গৃহীত)

জহরতের 'ভার' যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে। তবে উমর বিন আবদুল আযীয যখন খলীফা হন স্ত্রীকে সমুদয় গহনা বাইতুল মালে জমা দিতে বলেন। ফাতিমা রহ.-ও স্বামীর কথামতো সবকিছু বাইতুল মালে দিয়ে দেন। খেলাফতের দুই বছরের মাথায় উমর বিন আবদুল আযীয রহ. যখন মারা যান, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির জন্য ওয়ারাসাত হিসেবে কোনো সম্পদ ছিল না।

ফাতিমা রহ.-এর ভাই ইয়াযিদ ইবনু আবদুল মালিক যখন উমর ইবনু আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর খলীফা হন, তখন বোনকে বাইতুল মাল থেকে তার সমুদয় সোনা-গহনা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন।

তিনি তখন বললেন, এসব তো আমীরুল মুমিনের কথামতো বাইতুল মালে দান করে দিয়েছি,

مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً

'আমি জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করে মৃত্যুর পর তার অবাধ্য হতে পারব না।'[৮৬]

স্বামীর আনুগত্য করতে পারাটা লজ্জার কিছু না; বরং এই আনুগত্য আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। যারা এই আনুগত্যকে সম্মান ও ব্যক্তিত্বের হানিকররূপে আমাদের সামনে তুলে ধরে, তাদের না আছে সংসার, না আছে স্বামী, না আছে স্ত্রী, না আছে কোনো শান্তি। দেখেছেন না, কীভাবে সুইসাইড করে ধুমধাম মরে যায়।

৩. নিজের কাজটুকুতে দক্ষ হওয়া

যে কাজগুলো আপনাকে করতেই হয় সে কাজগুলো অন্তত ভালোভাবে শিখে রাখাটা ভীষণভাবে আপনাকে সাহায্য করবে।

সাধারণত আমাদের নারীদের কিছু কাজ করতেই হয়। যেমন : রান্না করা, ঘরদোর গুছিয়ে রাখা, বিশেষ করে রান্নাঘরটা, মেহমান এলে মেহমানদারী করা আর সন্তান লালন-পালন তো আছেই। যারা চাকরি করেন তারা যে গৃহের এ কাজগুলো থেকে নিজেদের খুব একটা দূরে রাখতে পারেন, তা না।

৮৬. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১৬০৩। (মাসিক আল কাউসার হতে গৃহীত)

স্বাভাবিকভাবে বাহির-ভেতর উনারাই সামলান; হ্যাঁ, ব্যতিক্রম কিছু আছে, সেটা তো থাকবেই।

আপনি যদি চাকরিজীবী হন, তাহলে আপনার চাকরির ডোমেইনে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। চাকরিটাও সুন্দর করে করলেন। মানুষ যখন তার নিজের কাজটা সুন্দরভাবে করে, তখন আর না-মানা দায়িত্বগুলো মনের ভেতরে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে না। ভেতরে কেমন যেন আর খুঁতখুঁত করে না। ঠান্ডা মাথায় থাকা যায়।

ধরুন, আপনার নতুন বিয়ে হয়েছে। রান্নাবাড়া তেমন কিছুই পারেন না, ঘরের কাজও তেমন পারেন না। ঘরে দু-একজন মানুষও যদি দুই-একদিনের জন্য মেহমান হিসেবে আসে তখনো এসপার-ওসপার চিন্তা হয়। 'হায় আমার কী হবে!' আপনার মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ে! আপনি কীভাবে মেহমানদের যত্ন-আত্তি করবেন? সারাবেলা তো আর রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে এনে খাওয়ানো যায় না। আপনি একধরনের মানসিক চাপ অনুভব করবেন। সেই মানসিক চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে দেবে, যতটা ক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রমও করবে না।

দুই-তিনটা আইটেম রাঁধতেই আপনার অনেক সময় লেগে যাবে! আপনি ভাবতে থাকেন, কেন আমি কোনো সময় পাই না। আর শ্বশুরবাড়ির মানুষজন ভাবতে থাকে, দুজন মানুষ, কোনো কাজকর্ম নেই, করে কী সারাদিন?

এই আপনিই যখন আপনার প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলো শিখে যান, তখন একহাতে সংসার, বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, বাচ্চাদের পড়ানো, স্বামীর খেদমত, শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর—সবকিছু সমান তালে করতে পারেন। নিজেই নিজেকে দেখে অবাক হয়ে যান।

দেখেন না, আমাদের দেশে মেয়েদের যখন প্রথম সন্তান হয়, সে পারে না বাচ্চাকে কোলে নিতে, পারে না গোসল করাতে, পারে না কাপড়চোপড় পরাতে। সবকিছুতেই তার বড় একজনের সাহায্য লাগে। সন্তান জন্মের পর পুনরায় আবার স্বাভাবিক সংসারের কাজে ফিরে আসতে মেয়েটার বেশ সময় লেগে যায়। এ মেয়েটিই যখন দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দেন, তার এই পরনির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে যায়। যখন তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেন তখন সে একাই সব পারে। নারীরা এমনই।

আপনি মনে করলেন, এখন শুয়ে থাকব, কোনো কাজ করব না। কিন্তু আপনার অনেকগুলো জরুরি কাজ পড়ে আছে, করা দরকার। সকালের নাস্তা বানানোর সময় মনে হলো, থাক একটু পরে বানাই। কিছুক্ষণ ঘুমাই। আপনি কিছুক্ষণ গড়িমসি করতে করতে শুয়ে থাকলেন। বিছানা থেকে উঠে দেখলেন, হায় হায়, দেরি হয়ে গেছে। বাচ্চাদের টিফিন রেডি করতে হবে, মাদরাসায় নিয়ে যেতে হবে, খাওয়াতে হবে। অনেক কাজ দেখে সাথে সাথে মাথাটা আমার গরম হয়ে যায়।

তবে কাজগুলো জিম্মায় না রেখে সময়মতো যদি করে ফেলা যায়, তাহলেই বরং আরামের সময়টা কিছুটা হলেও বেশি পাওয়া যায়। কাজ সেরে যখন আরাম করা হয়, আরামটা তখন খাসা আরামই হয়। মনের মধ্যে তখন আর দায়িত্ববোধ ঘেউ ঘেউ করে না।

আমাদের সব মহিলাদেরই মোটামুটি আরেকটা কাজ করতে হয়, তা হলো— ঘরবাড়ি গুছিয়ে রাখা। স্বামী, ছেলে-মেয়ে বা গৃহচারিকা, হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু মূল দায়িত্ব আপনারই থাকে। ভাবা দরকার, এই কাজটাকে আরেকটু সহজভাবে করা যায় কি না।

যেমন ধরুন আপনি যখন ঘর গোছানো শুরু করেন, তখন সবার প্রথমে বিছানাটা ঠিক করে ফেলতে পারেন। বিছানা ঘরের মধ্যে অনেক বড় জায়গা জুড়ে থাকে। বিছানাটা গুছিয়ে ফেলতে পারলে মনের মধ্যে একটা মোটিভেশন আসে। মনে হয়, এই তো গুছিয়ে ফেললাম। আর অল্প একটু বাকি আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে এটুকুও হয়ে যাবে।

আমাদের সবার সংসারেই অনেক জিনিসপত্র থাকে। সংসারের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব টুকিটাকি জিনিসের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যারা ভাড়া বাসায় থাকেন, মাঝে মাঝে বাসার পরিবর্তনের সময় তারা অনুভব করতে পারেন, একটা সংসারে কত ধরনের জিনিস থাকে!

যাই হোক, ঘরবাড়ি গোছানোর কাজটা সহজ করতে চাইলে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হলো, দরকারি ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আলাদা করে ফেলা।

আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, দরকারি জিনিস তো বুঝি, কিন্তু কোন জিনিস ভবিষ্যতে আমার দরকার লাগবে না সেটা কীভাবে বুঝব?

গবেষণা বলে, কোনো জিনিস যদি ছয় মাসের মধ্যে আপনার কোনো কাজে না লাগে, বুঝতে হবে সে জিনিসের খুব একটা প্রয়োজন নেই। ছয় মাসের মধ্যে লাগেনি এ রকম কোনো জিনিস হাতের নাগালে রাখার দরকার নেই। হ্যাঁ, আপনার যদি বাসা পরিবর্তন করতে হয়, বিভিন্ন প্যাকেজিং সিস্টেম সংরক্ষণ রাখতে হয়, সেটা হাতের নাগালে রাখা লাগে না। সবাই সাধারণত এ ধরনের প্যাকেজিংগুলো টয়লেটের ফলস ছাদে রাখে।

এ ছাড়াও আপনি অনেক ঘরেই দেখতে পাবেন, এমন অনেক জিনিস তাদের হাতের কাছে আছে, যেগুলোর তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। অনেকের রান্নাঘরেও আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘনঘটা দেখতে পাবেন।

বিশেষ করে রান্নাঘরে বেশি জিনিস থাকলে সেটা পরিষ্কার করা আরও কঠিন, আরও সময়সাপেক্ষ হয়ে যায়। চিমনি থাকলেও কিছুটা তেল চিটচিটে ভাব থাকেই। আর চিমনি না থাকলে তো কথাই নেই। তাই ঘরের জিনিসপত্র যতটা সংক্ষেপ করা যায়, ততই সুবিধা।

সফল মানুষদের ওপর একটি গবেষণা করে দেখা যায়, রাতে ঘুমানোর আগে তারা রান্নাঘর পরিষ্কার করে তারপর ঘুমান। এটা অনেকটা আজকের কাজ আজই সেরে ফেলার মতো।

অধিকন্তু, আমাদের কাপড়চোপড় গোছানোর একটা ব্যাপার থাকে। কাপড়চোপড় এলোমেলো হলে সাথে সাথে যদি গুছিয়ে নেয়া হয়, তাহলে আর জমে না। একসাথে বেশি কাজ তৈরি হয় না।

কাপড়চোপড়ের ক্ষেত্রে যেগুলো আপনার পরতে ভালো লাগে না বা পুরোনো হয়ে গেছে বা অনেকদিন ধরে পরা হচ্ছে না, সেগুলো আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন, অথবা দরিদ্র কাউকে দিয়ে দিতে পারেন। এতে আপনার গোছগাছের আইটেম কমবে, সাথে আরেকজনের উপকার হবে। দয়া করে জমিয়ে রাখবেন না। মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে দান করে দিলে শুধু গোছানোর কষ্ট কমবে না, দশ গুণ বেশি পাওয়ার পথ তৈরি হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ আছে,

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশ গুণ পাবে।[৮৭]

এ ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে দানের একাধিক উপকারের সুসংবাদ কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায়।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

'প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দুআ করে বলে, হে আল্লাহ, দানকারীর মালে বিনিময় দান করো (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি করো)। আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদুআ করে বলেন, হে আল্লাহ, কৃপণের মাল ধ্বংস দাও।'[৮৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে না।'[৮৯]

আরেকটি কাজ আমাদের মায়েদের করতে হয়, তা হলো সন্তান লালন-পালন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণ প্যারেন্টিং খুবই সহায়ক। শাশুড়ি-মা যখন দেখেন, বউ-মা তার নাতি-নাতনিদের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন, সাধারণভাবে এই বিষয়টা শাশুড়ি-

৮৭. সূরা আনআম, (৬) : ১৬০

৮৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১০

৮৯. সূরা বাকারা, (২) : ২৬২

মাকে প্রীত ও আশাবাদী করে। শাশুড়ি-মা এতে খুশি হন। আর যেসব শাশুড়ি-মায়েরা খুশি হয় না, তারা আসলে বউ-মার হাত আছে এমন কোনো কিছুতেই খুশি হন না। তারা সর্বদা ভয়ে থাকেন, বউ-মার কোনো কিছুতে উৎসাহ দিলে না জানি সে আবার মাথায় চড়ে বসবে কি না! তাদের কথা বাদ দিন। প্যারেন্টিং আপনার দায়িত্ব।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'মনে রেখো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাদের ওপর দায়িত্বশীল। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানদের ওপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের ওপর দায়িত্বশীল। সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৯০]

যেসব মায়েরা প্যারেন্টিংয়ের দায়িত্ব পালনে ধৈর্য রাখতে ব্যর্থ হন, তারা বাচ্চাদের দুষ্টামি দেখে বেশি বেশি দুষ্টামি করা শুরু করেন। চিল্লাচিল্লি, রাগঝাল, হইচই ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। ঘর হয়ে যায় রীতিমতো নরক। এই ঘরের সবার মাথা থাকে গরম। স্বামী তখন বিভিন্ন অজুহাতে বাচ্চা ঘুমালে বাসায় আসার কথা ভাবেন। শ্বশুর-শাশুড়ি দেখেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী হবে!

তখন আসলে সন্তান আপনাদের সকলের মাঝে আলাদা আলাদা দেয়াল তৈরি করতে থাকে। সন্তান তখন থাকে না আর সেতুবন্ধন।

---

৯০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯

আপনাকে অবশ্যই প্যারেন্টিং সম্পর্কে জানতে হবে, জানার চেষ্টায় থাকতে হবে। এটা আপনার খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। মানুষ তৈরি করার চিরন্তন প্রক্রিয়া মনে করে প্যারেন্টিং সম্পর্কে সচেতনতার সাথে জানাটা যেমন দায়িত্ব, তেমনই মানাটাও দায়িত্ব। প্যারেন্টিংয়ের এই কঠিন কাজটা কীভাবে সহজে করা যায় সে বিষয়ে কিছু চিন্তা-ফিকির করতে পারেন। কিতাবাদি পড়তে পারেন।[৯১]

এসবের বাইরেও আমাদের অনেকেরই অনেক কিছু করতে হয়। একেকজনের কাজের ক্ষেত্র একেক রকম। সাথে সাথে একেকজনের একেক রকমের দক্ষতা আছে। আমাদের আসলে শিখে নিতে হবে, যে বিষয়গুলোতে কমতি আছে সেগুলো কীভাবে আরেকটু ভালো করা যায়।

আপনার শৈল্পিক ঘরকন্না আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টে যেমন সহায়ক হবে, তেমনই সমাজের জন্য নতুন কিছু করতে উৎসাহিত করবে। আপনি সময় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগটুকু অন্তত পাবেন।

৪. আকর্ষণীয় নারী হতে কোন ব্র্যান্ডের মেকআপ প্রয়োজন?

সাজগোজ, সৌন্দর্য নারীদের একটি দুর্বল দিক। কারণে-অকারণে সে সাজতে ভালোবাসে এবং সেই সৌন্দর্য আরেকজনকে দেখাতে পছন্দ করে।

'এই সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে' সেই ভয় দেখিয়ে ফেমিনিস্টরা আমাদের সতর্ক করে—সংসারের ঘানি মাথায় নিয়ো না, সন্তান ধারণের দরকার কী? ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে, চেহারায় বয়সের ছাপ পড়বে; তারচেয়ে নিজেকে সুন্দর রাখো, আকর্ষণীয় হও, নজর কাড়ো।

আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য নারীরা যত সৌন্দর্যের পেছনে ছুটছে, মেকআপ ইন্ডাস্ট্রিগুলো তত শক্তিশালী হচ্ছে। মার্কেট রিসার্চ থেকে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী Beauty Industry (সৌন্দর্য শিল্প) দিনের পর দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ২০২০ সালের ৪৮৩ বিলিয়ন ডলারের এই মার্কেট ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে ৫১১ বিলিয়ন ডলারে। ২০২৫ সালের মধ্যে তা নাকি ৭১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে

৯১. এ বিষয়ে উমেদ প্রকাশ থেকে প্রকাশিত লেখিকার 'ভালো মা-বাবার দুষ্টু বাচ্চা' বইটা সাহায্য করতে পারে।

যাবে। ব্যক্তিগত বিউটি প্রোডাক্টগুলোর ব্যবহার যেমন দিন দিন বাড়ছে, অলিতে-গলিতে গড়ে ওঠা পার্লারগুলোতেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সবকিছুর পেছনে আছে নারীর আকর্ষণীয় হবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

ধরুন দশজন একসাথে বসে আছেন, গল্পগুজব করছেন। এই দশজনের মধ্যে দু-একজন এমন থাকবে, যাদের প্রতি অন্যান্যরা একধরনের টান বা আকর্ষণ অনুভব করবে। প্রশ্ন হলো, তাদের কোন বিষয়টা অন্যদের আকৃষ্ট করছে? তাদের সাজগোজ, পোশাক-আশাক, কালার ম্যাচিং করা জুতা-ঘড়ি-চশমা, অলংকারাদি—কোনটা?

নাকি তাদের কথা বলার ধরন, তাদের আত্মবিশ্বাস, কণ্ঠের দৃঢ়তা, তাদের সহানুভূতি, তাদের সহমর্মিতা, তাদের বিচক্ষণতা? অর্থাৎ ভেতরের সৌন্দর্য নাকি বাইরের সৌন্দর্য? কোন জিনিসটা আপনাকে আকৃষ্ট করে? বাইরের সৌন্দর্য হয়তো নজর কাড়ে, কিন্তু আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট করে কোনটি?

আপনার আশেপাশে যত পরিচিত মানুষ বা আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের সবাইকে কিন্তু আপনার একই রকম ভালো লাগে না। কাউকে বেশি ভালো লাগে, কাউকে কম। আপনার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয়, যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আপনি বেশি টান অনুভব করেন, সেগুলো কী কী?

আপনি হয়তো বলবেন, আমার অমুক আপুকে খুব ভালো লাগে। কারণ তিনি খুব হাসিখুশি। সব সময় মুখে হাসি লেগেই থাকে। হতাশার কোনো কথা আপুর মুখে কোনো দিন শুনিনি। দুঃখ-কষ্ট আমাদের সবার জীবনেই আছে, কিন্তু কারও সাথে মুখ ভার করে ব্যর্থতা, অপূর্ণতার গল্প করতে শুনিনি; বরং চোখের দিকে তাকিয়ে, হাত নেড়ে আপুকে বলতে শুনি, 'সমস্যা আজ আছে কাল নেই, একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে।' নিজে যেমন আশা নিয়ে বাঁচেন, তেমনই অন্যের মনের মধ্যেও আশা জাগাতে পারেন। একটা মানুষ হাসিমুখে সবকিছু কীভাবে ম্যানেজ করেন উনাকে না দেখলে বোঝা যায় না। কাজকাম তো আমরা সবাই করি, কিন্তু হাসিমুখে কাজ করা বা আনন্দের সাথে কাজ কয়জন করতে পারে।

আবার বলবেন, অমুক খালাকে আমার খুব ভালো লাগে। কারণ, এই মানুষটার মধ্যে তার আবেগ-অনুভূতি বা আচরণ নিয়ন্ত্রণের চমৎকার ক্ষমতা আছে। উনার সাথে যে যেমন ইচ্ছা আচরণই করুক না কেন, উনার সেই আদরমাখা

প্রতিক্রিয়ার কোনো অন্যথা হবে না। কখনো রাগের কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কিন্তু দেখিনি—উনি পাল্টা রাগঝাল করে পরিবেশকে আরও ভারী করে তুলেছেন। পারিপার্শ্বিকতা যেমনই হোক না কেন, প্রতিক্রিয়া যেন একদম উনার হাতের মুঠোয়।

আপনার দাদিকে খুব ভালো লাগে, কারণ তিনি খুবই রসিক। উনার সাথে থাকলেই মন ভালো হয়ে যায়। ব্যস্ততার ফাঁকে সময় পেলেই মনে হয়, ওই মানুষটার সাথে কিছুটা সময় কাটাই। সাধারণত আমাদের দেশের রসিকতাগুলো অন্য কাউকে ছোট করা, অপমানিত করা হয়, অশ্লীলতা ও মিথ্যা নিয়েই বেশি সাজানো। কিন্তু মুসলমানের রসিকতাও যে কতটা সত্য ও শালীন হতে পারে, তা উনার রসিকতা থেকে বোঝা যায়। এ ব্যাপারে উনার হিকমত এতটা বেশি যে, রসিকতার সময়ও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সামনের জনের মানসিক-শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখেন। অনেকেই করতে পারে, কিন্তু উনারটা অন্যরকম।

আবার আপনি হয়তো বলবেন, অমুক ভাবিকে আমার খুব ভালো লাগে। কারণ, সে কখনো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে না। আচরণের মধ্যে একধরনের স্বচ্ছতা আছে। মনের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ, রাগ, হিংসা পুষে রাখে না। কোনো কিছুতে আমাদের থেকে কষ্ট পেলেও স্পষ্টভাবে বিনয়ের সাথে জানিয়ে দেন। কথা বলার সময় কিছু গোপন করা বা কাটছাঁট করে বলা উনার সাথে যায় না।

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা মতে, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোই দেখা যায়। তাদের গবেষণায় আরও পাওয়া যায়, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ খুব বিনয়ের সাথে না বলতে পারেন। কম গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন কাজগুলোকে হঠাৎ নাকচ করতে পারেন বা এড়িয়ে চলেন। যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিপূর্ণ ফোকাস করতে সমস্যা না হয়। সাময়িকভাবে অনেকে তাদের খারাপ ভাবলেও পরবর্তী সময়ে ভালোবাসে।

আমি হলফ করে বলতে পারি, মানুষের ব্যক্তিত্বের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মুগ্ধ করে, ভীষণভাবে টানে।

আসুন, আকর্ষণীয় হতে বিউটি ইন্ডাস্ট্রির নামকরা সব ব্র্যান্ডের দিকে না ঝুঁকে নিজের ভেতরের জগৎটাকে আরেকবার খুঁটিয়ে দেখি। না জানি কত মণি-মুক্তা সেখানে অবহেলায় পড়ে আছে।

যেসব বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

১. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফি., মাকতাবাতুল আশরাফ

২. ইসলাহী মাজালিস, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফি., মাকতাবাতুল আশরাফ

৩. হায়াতুস সাহাবা, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী রহ., দারুল কিতাব

৪. ইসলাহী নেসাব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মাকতাবাতুল আশরাফ

৫. ক্রোধ দমন নূর অর্জন, মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব রহ., হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

৬. আপবীতী, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহিমাহুল্লাহর আত্মজীবনী, থানবী লাইব্রেরি

৭. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহ.

৮. পারিবারিক বিবাদ কারণ ও প্রতিকার, মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী, ইকরা পাবলিকেশন

৯. মাসিক আল কাউসার, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

১০. রাহে বেলায়েত, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ., আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

১১. When the Two Seas Meet, Mumtaz Raffi

১২. Toxic in law, Susan Forward

১৩. What's a mother (in law) to do, Jane Angelich

১৪. You don't have to take it anymore., Steven Stosny PhD

১৫. Dealing with in- laws in Marriage, Cry's Joseph

১৬. Words of Power, Ellis Amdur

১৭. How not to hate your husband after kids, Jancee Dunn.

১৮. Difficult personalities, Helen McGrath & Hazel Edwards MEd

১৯. Dance of anger by Harriet Lerner PhD

২০. How to win friends and influence people, Dale Carnegie

২১. The Artist as Critic, Oscar Wilde

২২. সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক মহোদয় কর্তৃক কুরআনের আয়াত, হাদীসের মতন (মূল বাক্য) এবং অন্যান্য রিওয়ায়াত ও ঘটনার সূত্র মূল আরবী কপি হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা কুষ্টিয়াতে আর শ্বশুরালয় চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত কুমার নদীর তীরে আলমডাঙ্গা শহরে। বাচ্চাদের লেখাপড়া ও বাচ্চার বাবার চাকরির সুবাদে এখন ঢাকায় থাকি।

পেশায় একজন ফুলটাইম মা ও গৃহিণী। নিজের নামের চেয়ে 'মুসআবের মা' বা 'উম্মে মুসআব' নামে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করি।

রিলেশনশিপ ও প্যারেন্টিং নিয়ে শিখতে ও শেখাতে ভালোবাসি। ছোট পরিসরে মা ও টিনএজ মেয়েদের মেন্টরিং করি।

এর আগে উমেদ প্রকাশ থেকেই প্যারেন্টিং-বিষয়ক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নাম : ভালো মা-বাবার দুষ্টু বাচ্চা।

রাতে চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠে দরজায় টোকা না দিয়েই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার সাহেব। উনার মা ও স্ত্রী ভেতরে গল্প করছেন আর খিলখিল করে হাসছেন। দরজার বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে সেই হাসির শব্দ। চার বছরের বিবাহিত জীবনে ডাক্তার সাহেব কোনোদিন এ রকম হাসি শোনেননি; বরং এর বিপরীতটাই শুনেছেন দিনের পর দিন। ডাক্তার দাঁড়িয়ে রইলেন, আনন্দে তার গলা ভারী হয়ে এল।

ওই ডাক্তারের মতো সব ছেলেই চায় তার মা ও স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকুক। কেননা পুরুষের জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই দুজন নারী। সংসারে এই দুই নারীর আন্তরিক মেলবন্ধন সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় পুরুষকে।

সংসার জীবনে ব্যাপক আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ এই নারীদ্বয়ের সম্পর্কের সমীকরণ মিলানোর এক রোমাঞ্চকর আয়োজন—অন্দরমহল!